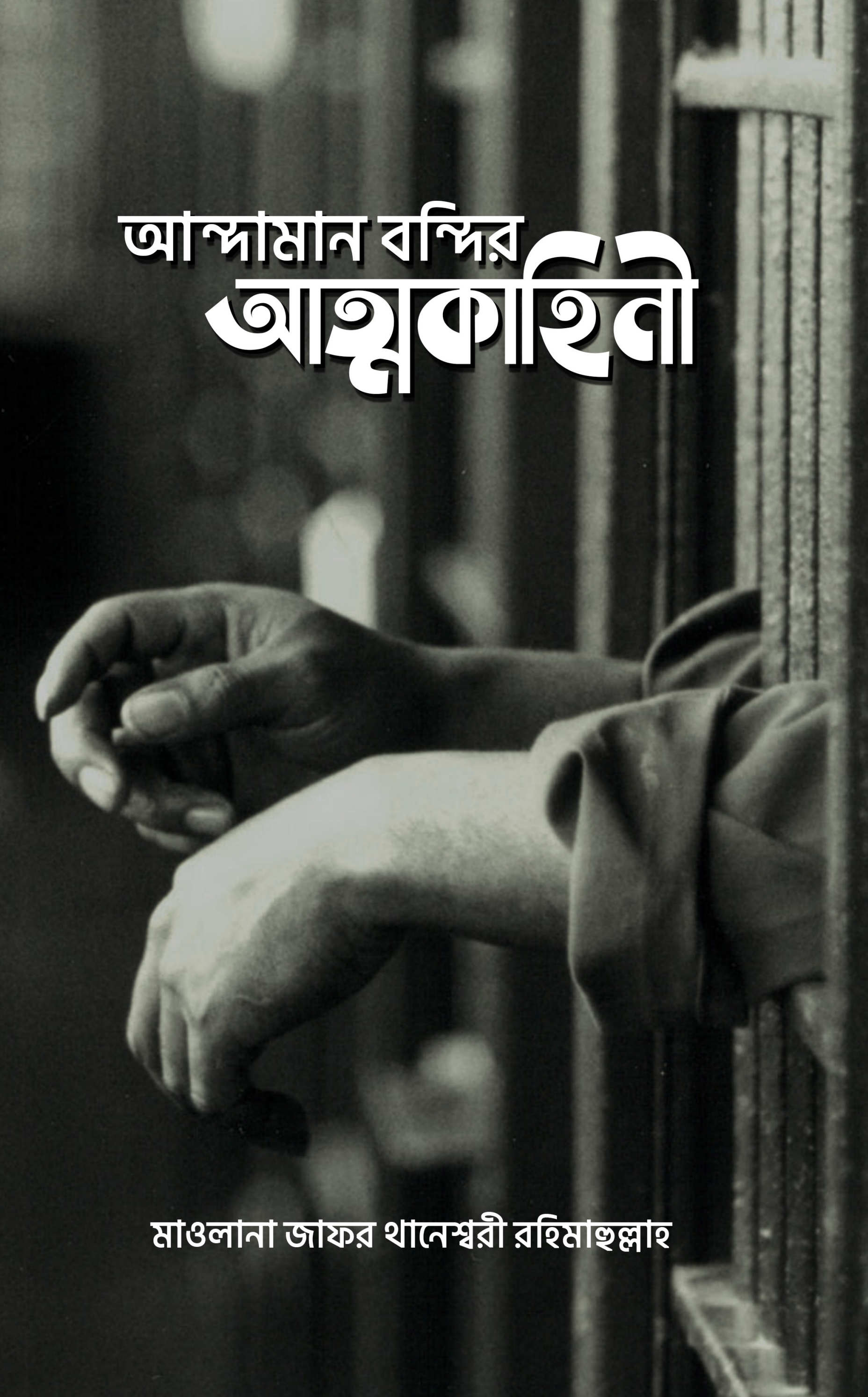

আন্দামান বন্দির
আত্মকাহিনী

মাওলানা জাফর থানেশ্বরী রহিমাহুল্লাহ

আন্দামান বন্দির
আত্মকাহিনী

মাওলানা জাফর থানেশ্বরী রহিমাহুল্লাহ

AL-FIRDAWS
আল-ফিরদাউস

ভূমিকা

আন্দামান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সারা ভারতের বন্ধু-বান্ধব ও হিতৈষীরা আমার বন্দী জীবনের ইতিহাস জানতে চেয়ে সহস্রকণ্ঠে প্রশ্ন করতে থাকেন– কিন্তু দীর্ঘ বিশ বছরের নির্বাসিত জীবনের অতীত কাহিনী যুগপৎ সকলের খিদমতে পেশ করা সম্ভব ছিল না। তাই সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী দিয়ে এই বইখানা প্রকাশের প্রয়োজন বোধ করি।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে “তাওয়ারীখ-ই-আজিব” নামে একখানা বই লিখি– সে আন্দামানের রাজধানী পোর্টব্লেয়ারের ইতিহাস। তার কিছুদিন আগেই আমার মুক্তির আবেদনপত্রটি গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর নাকচ করেছিলেন। ফলে, অধিকাংশ সরকারী কর্মচারী বিশেষ করে, ছোট বড় নির্বিশেষে সর্বসাধারণের মনে একটি ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। সে হল, আমি আর ছাড়া পাবো না। কিন্তু আমার মনোভাব আলাদা, করুণাময়ের অনন্ত অনুগ্রহ সম্বন্ধে

---

* ‘আন্দামান বন্দীর আত্মকাহিনী’ নামে উর্দু ভাষায় লেখা ‘তাওয়ারীখ-ই-আজিব’ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক মাওলানা হাসান আলী এবং সম্পাদনা করেছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। এই বাংলা অনুবাদটিই আমি আমার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। এজন্যে অনুবাদক ও সম্পাদক উভয়ের কাছেই আমি কতজ্ঞ। - লেখক

কোনদিনই একদম নিরাশ হইনি। উল্লিখিত বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলাম, গোটা দুনিয়াটাই যখন আশার বন্ধনে আবদ্ধ, তখন যবনিকার অন্তরাল কি রহস্য উদ্ঘাটিত হয় তাই দেখা যাক। উপসংহারে পাঠকদের খেদমতে এও নিবেদন করেছিলাম, তারা যেন দোয়া করেন যাতে সরকার আমাকে এই নির্বাসন থেকে সরিয়ে নেন, আর আমি দেশে ফিরে গিয়ে মাতৃভাষায় এ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করতে পারি।

আশ্চর্য, বই প্রকাশ হওয়ার পরপরই বিনা আর্জিতে আমার মুক্তির নির্দেশ এসে পড়লো। আদেশ দিলেন তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড রিপন। অবাক হয়ে ভাবি, এ যেন এক রহস্যময় হস্তক্ষেপেরই ফল।

থানেশ্বর শহরের ডেপুটি কমিশনার আমার বাসস্থান খানা তল্লাসী করার জন্যে টেলিগ্রাম যোগে আম্বালা জেলার কর্তৃপক্ষকে যার অধীনে থানেশ্বর শহর অবস্থিত, সংবাদ জ্ঞাপন করেন। সংবাদদাতা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমার একজন পুলিশ বন্ধু ডেপুটি কমিশনারের সাক্ষাৎ মানসে তাঁর বাংলোতে উপস্থিত হন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তা জানতে পারেন এবং তাঁর ভৃত্য ও আমার প্রতিবেশী কাল্লুকে দুঃখের সঙ্গে তা বলেন। কাল্লু অবিলম্বে আমাকে সতর্ক করবার জন্যে তক্ষুণি থানেশ্বরের দিকে ধাবিত হলো।

ভাগ্য আমার সংবাদদাতাকে আমার দরওয়াজার সম্মুখ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। ওদিকে টেলিগ্রাম পেয়ে আম্বালার পুলিশ সুপার ক্যাপ্টেন পার্সন এক বিরাট বাহিনীসহ খানা-তল্লাশীর পরোয়ানা নিয়ে সে রাতেই আমার বাড়ি এসে হাজির।

অদৃষ্টের পরিহাস লক্ষ করুন, দুইজন লোক– একজন কর্ণাল থেকে আমাকে অবহিত করার জন্য, অপরজন আম্বালা থেকে আমার গৃহ তল্লাশীর জন্য রওনা হলেন। প্রথমজন একজন পুলিশ, আমার হিতৈষী, কিন্তু আমার উপকার করতে পারলো না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি রাত্রি দুটোর সময় আমার বাড়ি পৌঁছে বাড়ির চারদিক ঘিরে ফেললেন। তারপর ডাকলেন আমাকে। বাইরে এসে দেখি অভিনব দৃশ্য। সুপার আমাকে ওয়ারেন্ট দেখিয়ে বললেন– ইনকোয়ারির অনুমতি দিন।

বুঝলাম গুরুতর কিছু ঘটেছে। চিন্তা করে দেখলাম প্রথমে ভেতরের ঘরে তল্লাশী হওয়াটাই ভাল। কারণ বাইরের ঘরে যে সর্বনাশা চিঠিটা লেখা রয়েছে তা যেন কোনক্রমেই পুলিশের হাতে না পড়ে। কিন্তু যা হবার তা হয়েই আছে, তা রোধ করার বৃথাই চেষ্টা। ও ঘরে মুনশী আবদুল গফুর ও আরো কয়েকজন নিদ্রিত ছিলেন। আমি এই বলে উঁচু গলায় ডাকতে থাকি 'পুলিশ সুপার ইন্‌কোয়ারীর

জন্যে বাইরে আছেন– জলদি দরজা খুলুন ।

আমার উদ্দেশ্য ওরা যেন তল্লাশীর কথা শুনে দরজা খোলবার আগেই ঐ বিষাক্ত পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলেন । সুপার আমার অভিসন্ধি বুঝতে পেরে আমাকে বাধা দিলেন । আমি তাঁর বাধা উপেক্ষা করে চেঁচাতেই থাকি । কিন্তু যা চেয়েছিলাম কপাল তা হতে দিল কই! ভেতরের শায়িত লোকগুলো আমার চিৎকারের ইঙ্গিত কিছুই বুঝতে পারলো না; বরং ঘাবড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলো ।

বৈঠকখানায় অনুসন্ধান চলতে লাগলো এবং সেই পত্রখানা, যার জন্যে এত কিছু, সর্বপ্রথম আগে আমি এটা লিখেছিলাম । চিঠিটাতে মুজাহিদ বাহিনীর নামে কয়েক হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণের কথা আছে । এছাড়া পাটনা থেকে পাওয়া আরো কিছু পুরনো চিঠি এবং আম্বালা নিবাসী মোহাম্মদ শফীর পত্রখানাও ওরা পেয়ে গেল । এ সকল চিঠিপত্রে আপত্তিকর বিশেষ কিছু না থাকলেও এর ফলে পুলিশ বুঝতে পারলো যে, মুহম্মদ শফী ও পাটনার কিছু সংখ্যক লোকের বাড়ি অনুসন্ধান করা একান্তই অপরিহার্য । (এখানে) অনুসন্ধান কার্যশেষ করে পুলিশ মুনশী আবদুল গফুর আমার একজন মহুরী আর আব্বাস নামে একজন বাঙ্গালা ছেলেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল । আমিও পুলিশের দারুণ সন্দেহভাজন কিন্তু পরোয়ানা ও সরকারী মঞ্জুরীর অভাবে বোধ হয় এ যাত্রা রেহাই পেলাম ।

তবু পুলিশ চলে গেলে, আমার কর্তব্য সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন হল (আমার) । আমার ঘর থেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ স্বরূপ যে সকল কাগজপত্র তাদের হস্তগত হয়েছে আমার শাস্তির অনুকূলে সেগুলোই যথেষ্ট ছিল । তাই এখান থেকে ফেরার হওয়াই সঙ্গত মনে করলাম । এ ঠিক যে, প্রত্যক্ষভাবে আমি প্রহরাধীন ছিলাম না, কিন্তু তারা চতুর্দিক থেকে আমার সন্ধান নিচ্ছিল । মা ও স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করলাম । আত্মগোপনে তাদের সম্মতি নিয়ে বের হয়ে যাই । একটা চালাকি করলাম । বাড়ি থেকে রওনা দিয়ে প্রথমত পিলাপিলি নামক স্থানে গিয়ে হাজির হলাম । সেখানে তহসীল ও থানা আছে । সেখানকার কর্মচারী ও পুলিশদের কাছে আমার কর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ চাইলাম । তাদের সকলেই একবাক্যে আম্বালা গিয়ে ব্যাপারটার আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত জেনে আসতে বললো ।

ফেরার

তাদের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ শেষে সন্ধ্যে বেলা পথে এসে নামলাম এবং বড় সড়ক ধরে পিলাপিলি থেকে আম্বালার দিকে রওয়ানা দিলাম । তখন তাদের অনেকেই অনুরাগ ও অনুকম্পাভরে সকরুণ দৃষ্টিতে আমাকে চেয়ে দেখছিল ।

আমি অশ্বারোহণ করেছি, তখন সকলেই বিশ্বাস করছিল আমি সত্যিই আম্বালা যাচ্ছি। দিনের আলো যতক্ষণ ম্লান হয়নি, আমি ঐ রাজপথ ধরে বরাবর আম্বালার দিকেই এগিয়ে চলছিলাম। মাইলটেক রাস্তা ছাড়িয়ে যেতে না যেতেই অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। আম্বালার সড়ক ছেড়ে দিয়ে নিবিড় জঙ্গলের ভেতরে প্রবেশ করলাম। জঙ্গলের পথ ধরে থানেশ্বরের কাছাকাছি আমার নিজ জমিদারীর অন্তর্গত একটি পূর্ব নির্দেশিত জায়গায় যখন আসি, তখন রাত আটটা বাজে। দেখি, পরামর্শমতো আমার মা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আর ছোট ভাই সাঈদ আমার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের জন্য আগেই উপস্থিত। তারপর, কয়জনকে সেখানেই ছেড়ে দিয়ে আমি স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে নিয়ে একখানি দ্রুতগামী গাড়িতে করে ভোরবেলা পানিপথে পৌঁছি। বত্রিশ ক্রোশ রাস্তা কম নয়। শহরে প্রবেশ না করে সড়কের উপরই সহধর্মিণী ও পুত্র-কন্যাদের বিদায় করলাম। সেখান থেকে একযোগে চল্লিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে পরদিন একা দিল্লী গিয়ে উঠি। মিয়া বশীর উদ্দিন সওদাগরের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। www.boighar.com

এখানে থানেশ্বরের মিঞা হুসাইনী, পাটনার হুসাইনী ও আবদুল্লাহ নামে এক বাঙ্গালীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। শেষের দুইজন পাটনা থেকে কিছু আসরাফী নিয়ে এসেছিল। আমি সেগুলো তাদের কাছ থেকে নিয়ে থানেশ্বরের মিঞা হুসাইনীর হাতে দিলাম। তাকে নির্দেশ দিলাম, সে যেমন করেই হোক, এই অর্থ যেন সীমান্তে মুজাহিদ বাহিনীর নিকট পৌঁছে দেয়। হুসাইনী থানেশ্বরীকে বিদায় দেবার পর, আগন্তুক দু'জনকে আমার সঙ্গে পূর্বদিক নিয়ে যাবো ঠিক করি। তখন পর্যন্ত এই ধারণাই পোষণ করছিলাম– পথ পরিবর্তনের আমার এই চালাকি কেউ বুঝতে পারেনি। কাজেই আমার সন্ধানে এদিকে আসবে না কেউ। আম্বালায় বা তার পশ্চিম উপকণ্ঠেই আমার খোঁজাখুঁজি হতে থাকবে।

এজন্যে দিল্লী পৌঁছেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিনি। বরং শিকরাম ভাড়া করার জন্য স্বাভাবিক পোষাকে আমি স্বয়ং চাঁদনি চক পর্যন্ত গেলাম।

পনেরো ডিসেম্বর আমরা তিনজন শিকরামে সওয়ার হয়ে আলিগড় কোয়েলের পথে যাত্রা করি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোয়েলে পৌঁছে রেলগাড়ীতে চড়তে হবে। প্রাণপণে চলবার জন্যে গাড়োয়ানদের বকশিশ দিলাম। তখন পর্যন্ত কোয়েলের বাইরে রেললাইন বিস্তার লাভ করেনি।

তাড়াতাড়ি ষ্টেশানে পৌঁছাই একমাত্র কামনা। কিন্তু কি করিব, ভাগ্যের ফের। কয়েকটি চৌকিতে ঘোড়া না পাওয়ায় গাড়ী অকেজো। তখন বাধ্য হয়ে অন্য একটি ভাড়া করলাম। এত চেষ্টা সত্ত্বেও আলিগড়ে পৌঁছতে দেরী হয়ে গেল।

তবু আমার মনে হলো, যে খেলা খেলে এসেছি তাতে কিছুদিন অন্তত কেউ

আমাকে এ পথে সন্ধান করতে আসবে না। এবার আম্বালার দিকে একটু ফেরা যাক।

বারই ডিসেম্বর পার্সন সাহেব তল্লাশীর পর চলে গিয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করবার সরকারী অনুমোদন লাভ করেন। পরের দিন তিনি সেই পরোয়ানাসহ থানেশ্বরে এসে হাজির। আমাকে না পেয়ে সমগ্র শহরে মহাতাণ্ডব শুরু করে দিলেন। বহু বাড়িতে তল্লাশী করা হল। অসংখ্য নরনারী গ্রেপ্তার হয়ে গেল। তাদের মধ্যে ছিল আমার মা, ছোট ভাই ও তার বৌ। পুলিশ নির্মমভাবে এদের মারধোর করতে লাগলো। অকথ্য অত্যাচারের পরেও তারা ক্ষান্ত হলো না। পর্দানসীন মহিলাদেরকে এরূপ বেইজ্জতিও করা হলো যে, সে কাহিনী হৃদয় বিদারক। আমার স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করবার জন্য পানিপথ পর্যন্ত ধাওয়া করলো। কিন্তু মৌলভী রাজিউল ইসলামের নির্ভীক চেতা মায়ের সাহসিকতায় সে রক্ষা পেল।

অত্যাচার আর উৎপীড়ন সইতে না পেরে আমার ছোটভাই, যার বয়স তখন বারো কি তেরো, বলে দিল– আমার ভাই দিল্লী চলে গেছেন।

অনুসন্ধান ও পুরস্কার ঘোষণা

তৎক্ষণাৎ পার্সন সাহেব তাকে সঙ্গে নিয়ে ডাকগাড়ি যোগে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করলেন। এদিকে পাঞ্জাবের সর্বত্র আমার অনুসন্ধান চলতে লাগল। আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হল। ক্যাম্প আম্বালায় মুহম্মদ শফীর ঘরে খোঁজ করবার সময় দৈবাৎ তিনি লাহোরে ছিলেন। কাজেই তার দুইজন কর্মচারী গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। তারা সন্দেহের শিকার। একজন মৌলভী মুহম্মদ তকী, আরেকজন মুনশী আবদুল করিম। তাদেরকে ভয় দেখান হয়– যদি তারা সকল তথ্য প্রকাশ না করেন তাহলে তাঁদের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হবে। প্রাণের ভয়ে মুহম্মদ শফীর সহোদর রকী ও মৌলভী তকী, যিনি তাঁর বহু পুরাতন বিশ্বস্ত কর্মচারী ও মসজিদের ওয়ায়েয, মুহম্মদ শফীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে রাজী হয়ে গেলেন এবং পুলিশ যা শিখিয়ে দিল তাই আউড়ে জীবন রক্ষা করলেন। পক্ষান্তরে মুনশী আবদুল করিম পুলিশের তালিম মতো সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় বিনাদোষে মুহম্মদ শফীর সঙ্গে মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়লেন।

এদিকে পার্সন সাহেব দিল্লী পৌঁছে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত সমগ্র নগরী মন্থন করে ফেরলেন। হোটেল ও শহরের প্রবেশ দ্বারগুলো বন্ধ করে দিলেন। হাজার হাজার লোকের দেহ তল্লাশী ও শত শত লোককে গ্রেফতার করা হল। এ সকল ধরপাকড়ের সময় তাঁর কর্ণগোচর হলো, আমি অমুক শিকরাম যোগে

অমুক সময়ে আরো দু'জন লোককে সঙ্গে নিয়ে আলিগড় কোয়েলে রওয়ানা হয়ে গেছি। তিনি তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম যোগে আলিগড়ে আমাকে গ্রেফতার করবার নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন।

গ্রেফতার

অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাস, আলিগড় বা আমার বাড়ি থেকে মাত্র দুশো মাইল দূরে, সেখানে যাওয়া মাত্র টেলিগ্রাম গিয়ে পৌঁছে। তখনই পুলিশ আমাদের বেষ্টন করে ফেলল। এরপর জেলা সুপারের বাংলোতে নিয়ে গেল। তিনি আমাদের ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আমি আর আমার সাথী দুইজনকে গ্রেফতার করে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট যে তার বার্তা পাঠানো হলো, তার জবাব না আসা পর্যন্ত পূর্বোক্ত স্থান থেকে আমাদের জেল হাজতে নিয়ে গেল।

সেদিনই সকাল বেলা আমি নামায পড়ছিলাম। তখন পার্সন সাহেব গিয়ে উপস্থিত হলেন। আমাকে বন্দীদশায় দেখতে পেয়ে অত্যন্ত খুশী। হুকুম দিলেন– 'একে ফাঁসির ঘরে খুব সাবধানে বন্ধ করে রাখ' আদেশ যথারীতি প্রতিপালন করা হলো।

একটা অতি সংকীর্ণ অন্ধকার কুঠরিতে নিয়ে আমাকে বন্ধ করল। তার চারদিকে দু'তিন জন পুলিশের পাহারা।

খাদ্য

জীবনে এই প্রথম আমার জেলখানার খাদ্য খাওয়া। দুটি রুটি ও কিছু শাক আমার ভাগ্যে জুটলো। শাকের বর্ণনা আর কি দেব? মোটামুটি কয়টি ডাঁটা ছাড়া তাতে পাতার চিহ্নমাত্র নেই আর সেগুলো চিবানও কঠিন। রুটিগুলো যে আটা দিয়ে তৈরী হয়েছে তার চার আনাই বালু আর মাটি। করুণাময়ের শুকরিয়া আদায় করে তাই খেলাম। আমার পরবর্তী কারাগারগুলোতেও প্রায় সর্বত্র কয়েদীদের জন্য এরূপ খাদ্যই দেখতে পেয়েছি। এর কারণ, কয়েদীরা পেট ভরে খেতে পায় না। সুতরাং তারা যখন গম ভাঙ্গতে বসে, তখন ক্ষুধার জ্বালায় সেরে সেরে আটা চিবিয়ে বা পানিতে গুলে খেয়ে ফেলে এবং আটাতে বালু মিশিয়ে ওজন পূরণ করে দেয়। এভাবেই জেলখানার বাগানে হওয়া শাকসব্জি ও তরিতরকারী বিক্রি করে দেয়া হয়, অথবা অফিসারদের ভোগে চলে যায়। অগত্যা, অকেজো ডাঁটাগুলো যা জানোয়ারেও খায় না, তাই দা দিয়ে কুপিয়ে

কয়েদীদের জন্য পাক করা হয়। ভূখা কয়েদীদের কাছে এগুলোই রীতিমতো নিয়ামত। তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলে। নবাগতদের তা হঠাৎ গ্রহণ করা কষ্টকর। কিন্তু শীঘ্র জঠর জ্বালায় কঠোর দাহনে তারাও একেই পোলাও কোর্মার চেয়ে উপাদেয় মনে করে; কারণ এ জগতে সকল স্বাদের মূল হল ক্ষুধা।

জীবন-মরণ

পরদিন পার্সন সাহেব আমাদের দুইজনকে সঙ্গে নিয়ে পরমানন্দে দিল্লী রওনা হলেন। বাহন শিকারাম, তাতে আরোহণ করবার পূর্বে আমার পায়ে বেড়ি, হাতে কড়া ও গলায় একটি তৌক বা গলফাঁসের সঙ্গে আরো একটি লৌহশৃঙ্খল সংযোজিত হল এবং তার অপরপ্রান্ত একজন অস্ত্রধারী সিপাইয়ের হাতে দিয়ে তাকে আমার পেছনে বসালেন। স্বয়ং তিনি ও একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর ডান বা দু'ধারে হাতে তাঁমাচা নিয়ে উপবিষ্ট; পথ চলতে চলতে বার বার শাসাচ্ছিলেন, যদি একটুও নড়াচড়া করি তাহলে এই তাঁমাচা দিয়ে মারবেন। আলিগড় থেকে দিল্লী পর্যন্ত খানাপিনা তো দূরের কথা, প্রাকৃতিক প্রয়োজনেও কোথাও একটু নামতে দেয়া হয়নি।

অবশেষে অতিকষ্টে লোহার শিকলি পরা অবস্থায় দিল্লী প্রবেশ করলাম। সেখানে ডিষ্ট্রিক পুলিশ সুপারের বাংলোতে একটি নিরন্ধ্র কক্ষে জীবন্ত কবরস্থ করার মতো আমাদের বন্ধ করে দেওয়া হল।

পরদিন দিল্লী থেকে কর্ণাল এবং কর্ণাল থেকে আম্বালায় অপসারিত হলাম। যখন সেখানে পৌঁছি, রাত অনেক। খাওয়া দাওয়ার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। বিনা পানাহারে আমাদের তিনটি প্রাণীকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নির্জন কক্ষে আবদ্ধ করা হল। এপ্রিলের শুরু পর্যন্ত আমরা এখানেই ছিলাম।

পরদিন ভোর বেলা মিঃ পার্সন, মেজর উনকফিল, পুলিশের ডি.আই.জি. এ আম্বালার ডিপুটি কমিশনার ক্যাপটেন টাই ইয়াজুজ মাজুজের মতো আমার কামরায় ঢুকলেন। তাঁরা আমাকে বললেন– 'যদি মঙ্গল চাও তো সব খুলে বল।'

বললাম, 'আমি কিছুই জানি না।'

তখন পার্সন সাহেব আমাকে খুব ধমকালেন। তাতে উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় প্রহার শুরু করলেন।

পিটুনি চরমে পৌঁছলে আমি পড়ে গেলাম। তখন টাই ও উনকফিল কামরার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। এই নিদারুণ মারের পরেও আমি স্বীকার করলাম না। তারা বিফল, বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরে গেলেন।

যুলুম আর অত্যাচার যখন এই পর্যায়ে পৌঁছলো, আমার বিশ্বাস হয়ে গেল এরা আমাকে কিছুতেই জীবন্ত ছেড়ে দেবে না। রমযানের কিছু রোজা কাযা ছিল, পরদিন থেকেই সেগুলো আদায় করতে থাকি।

আমি যখন রোযাদার, পরদিনও পার্সন সাহেব প্রত্যুষে এসে আবার মারপিট শুরু করলেন এবং কিছুক্ষণ পরে তাঁর গাড়িতে উঠিয়ে আমাকে টাই সাহেবের বাংলোতে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনটে দৈত্যই মজুদ ছিল। একসাথে তাঁরা আমাকে খুব তোয়াজ করলেন। বললেন– তুমি যদি অন্যান্য মুজাহিদ ও জেহাদে সাহায্য পাঠায় যারা, তাদের নাম বলে দাও, তাহলে আমরা লিখিত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তোমাকে সরকারী সাক্ষী করে শুধু মুক্তিই দেবো না রাজ সরকারের উচ্চ পদেও বহাল করবো। আর যদি কিছু না বলো, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে হবে।

কিন্তু আমি নির্বিকার। এত লোভ দেখিয়ে আমার স্বীকারোক্তি আদায় করতে না পেরে তারা ইংরেজিতে কি বোঝাপড়া করলেন, তারপর আমাকে একটি পৃথক কামরায় নিয়ে গেলেন। নিয়ে গিয়েই ফের মারপিট। আঘাতের পর আঘাত, প্রহারের পর প্রহার। আমি তার কতটুকুই বা বর্ণনা করতে পারি? সংক্ষেপে, সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এরূপ বিরামহীন প্রহার চলতে লাগল যে, কোন দিন কারো 'পরে এহেন নিষ্ঠুরতা সংঘটিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। বা-ফযলে ইলাহী সকলই সহ্য করে গেলাম এবং আপন প্রভুর সান্নিধ্যে এই মুনাযাতে নিমগ্ন ছিলাম, হে খোদা! দীন বন্ধু করুণা সিন্ধু! যে পরীক্ষা শুরু হয়েছে ঈমানের এই অগ্নিপরীক্ষায় অবিচলিত থাকবার তওফিক দাও!

তারা সর্বোতভাবে ব্যর্থ হলেন। তখন অনন্যোপায় হয়ে রাত আটটার পর আমাকে জেলখানায় ফেরত পাঠালেন।

সারাদিন রোযা ছিলাম। বাংলোর বাইরে এসে গাছের পাতা ছিঁড়ে ইফতার করলাম। অতঃপর জেলখানায় আমার যে খাবার রক্ষিত ছিল তাই খেয়ে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করে শুয়ে পড়ি।

'আন্দামান বন্দীর আত্মকাহিনী' পড়ে যাচ্ছেন কাসিদ আহসান সাহেব। দম বন্ধ করে শুনে যাচ্ছে লায়লা বানু। হজরত আলী, মেহের আলী ও অন্যান্যরা।

তহসীলদার

টাই সাহেবের বাংলোয় পুলিশ সুপারের হাতে নির্যাতন ভোগ করবার দিন বাংলোর বারান্দায় একজন মুসলমান তহসীলদার বসেছিল। জানতে পারলাম, তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তার অপরাধ আমার গ্রেফতার হওয়ার

কয়েক বছর আগে কিছু সাংসারিক ব্যাপারে আমাকে একটা পত্র লিখেছিল। আদালতের কয়েকজন কর্মচারী শত্রুতা করে কর্তৃপক্ষের নিকট এই পত্রের ভুল ব্যাখ্যা দাখিল করে। ফলে তার এই হাল। তার ম্লান মুখ দেখে নিজের বেদনা ভুলে গেলাম। মনে মনে ভাবতে থাকি, 'আহা! আমার মতো অপদার্থকে একটা চিঠি লেখার অপরাধে বেচারার কি দুর্গতি! তার বদলা যদি আমারই সাজা হতো! আর সে মুক্তি পেয়ে যেত!

অকথ্য নির্যাতনের মধ্যেও আমি তারই জন্য দোয়া করছিলাম। করুণাময়ের অনুগ্রহে শেষ পর্যন্ত সে ছাড়া পেয়েছিল এবং তার পর থেকে এখন পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের অধীনে উচ্চপদে বহাল আছে।

মিথ্যা সাক্ষ্য ও ধরপাকড়

ঐ তারিখের পর থেকে আর কোনদিন আমাকে সাক্ষী হওয়ার জন্য প্ররোচিত করা হয়নি। আমার সম্পর্কে সন্দেহাতীতভাবে নিরাশ হয়ে মুহম্মদ রফী ও মৌলভী তকীকে– যারা আমারই মতো কয়েদী– হস্তগত করবার সাধনায় তাঁরা কৃতকার্য হলেন এবং তাদেরকে সমস্ত গুপ্তরহস্যের সংবাদদাতা নিযুক্ত করে ছেড়ে দেন। এদেরই বর্ণনাক্রমে মুহম্মদ শফীকে, এই ব্যাপারের সঙ্গে যার সামান্যই সম্পর্ক, লাহোর থেকে গ্রেফতার করে আনা হয়। এদেরই নির্দেশে পার্সন সাহেব পাটনায় চলে যান। পাটনায় ঈশ্বরী প্রসাদ একজন পুলিশ কর্মচারী আর মিঃ টেইলার পাটনার ভূতপূর্ব পুলিশ কমিশনার। পরের জন ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মাওলানা আহমদুল্লাহ প্রমুখ মুজাহিদীনকে বিনা দোষে নজরবন্দী করে রাখার অপরাধে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছিলেন। এরাই এক্ষণে পার্সন সাহেবের সাহায্যকারী। তারা তার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কাজ করতে লাগলেন। এদেরই প্ররোচণায় পার্সন সাহেব মাওলানা ইয়াহহিয়া, আলী, মাওলানা আবদুর রহিম, এলাহী বখশ সওদাগর ও মিঞা আবদুল গাফফারকে গ্রেপ্তার করে পাটনা থেকে আম্বালা পাঠিয়ে দেন। এরপর তিনি বাংলাদেশে চলে যান। সেখানে বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য লোককে গ্রেফতার করেন। তাঁদের মধ্যে অনেককে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাবার ভীতি প্রদর্শন করে সাক্ষীর তালিকায় নাম লিখিয়ে নেন। হাজার হাজার টাকার বিনিময়ে ছেড়েও দেন অনেক লোক। একমাত্র কুমারখালি নিবাসী কাজী মিঞাজান অচল অটল রইলেন এবং গ্রেফতার হয়ে আম্বালায় পৌঁছলেন। দিল্লীর দুইজন সওদাগর বশীরউদ্দিন ও আলাউদ্দিন ও আরো বহুলোক দিল্লী থেকে গ্রেফতার হয়ে এলেন। ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অর্থাৎ পেশোয়ার থেকে দক্ষিণ ও পূর্ববাংলার সীমান্ত বরাবর কোন বিত্তশালী মুসলমান,

কোন মৌলভী, এমন কি কোন নামাযী পর্যন্ত এই ধরপাকড়ের হাত থেকে রেহাই পায়নি। পুলিশ যাকেই একবার আটক করেছে, তাকে দিয়ে নিজের পকেট গরম করে নিয়েছে। মোটকথা, এই প্রথম ধাক্কা ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত (১৮৬৩-৬৪) ধরপাকড়ের তুমুল ঝড় বইতে থাকে। শত শত লোককে ভয় দেখিয়ে ও শিখিয়ে পড়িয়ে সাক্ষী করে নেওয়া হয়েছিল। এই পার্সানী অভিযান (চবৎংড়হ্রহং ঊীঢ়বফরঃরড়হ) এর কবলে পড়ে বেচারা হুসাইনী থানেশ্বরীও অনেকগুলো আশরাফীসহ দিল্লী থেকে ফেরার পথে গ্রেফতার হয়। সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থও বাজেয়াপ্ত হলো এবং সে নিজে আমাদের সঙ্গেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল।

সত্যের বিকৃতি ও স্বার্থসিদ্ধি

এই ঘটনার সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, বড় বড় ইংরেজ অফিসার পর্যন্ত আইন কানুনের প্রতি চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন। ঈশ্বরী প্রসাদের মতো হিন্দু-মুসলমানেরাও ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে রশিকে সাপ ও সরিষাকে পাহাড়ে পরিণত করে দেখিয়েছে। অকারণে আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এবং আমাদেরকে নেপোলিয়ন বা মাহদী সুদানীর ন্যায় বৃটিশ গভর্নমেন্টের কল্পিত শত্রু সাজিয়ে তারা আপন আপন স্বার্থ উদ্ধারে ডিপুটি কালেক্টর প্রভৃতি পদসমূহে জুড়ে বসলো এবং অনেকেই গভর্নমেন্টকে প্রবঞ্চনা করে বড় বড় জমিদারী ও জায়গীর লাভ করলো। আর আমার সেই সংবাদদাতা গজন খাঁ নিজ পুত্রকে অবলম্বন করে সরকারের কাছ থেকে পুরস্কার স্বরূপ দু'একটি গ্রামের জায়গীর পেয়ে গেল।

এরপর ফের বই থেকে চোখ তুলে কাসিদ আহসান উল্লাহ সাহেব তার শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে মুখে বললেন–

'মিশকাত শরীফের সাক্ষ্য' শিরোনামে ছোট ছোট অনেকগুলো হেডিং সম্বলিত বিরাট এক অধ্যায় রচনা করেছেন মাওলানা জাফর থানেশ্বরী সাহেব। তাঁর বইতে এই অধ্যায় শেষ করে তিনি আবার মূল বর্ণনায় ফিরে এসেছেন। সেই মূল বর্ণনাই আবার পড়ছি, শোনো। পড়তে লাগলেন কাসিদ সাহেব–

অযথা হয়রানি

আবার সেই ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত আম্বালা যুদ্ধের দিকে ফিরে যাওয়া যাক। ব্রিটিশ সৈন্য নিতান্ত অকারণে নিজ রাজ্য সীমানার বাইরে পররাজ্য ইয়াগিস্তানে

জবরদস্তি আক্রমণ করে বসলে সমগ্র ইয়াগিস্তানের অধিবাসী ও সোয়াতের আকন্দ সাহেব ভয়ানক চটে গেলেন। আম্বালার ময়দানে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হল। লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে আফগানদের বশ করা না হলে একটি ইংরেজ সৈন্যও জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারতো না। এমনি অযৌক্তিক যুদ্ধে মরণপণ প্রতিরোধ খুবই স্বাভাবিক। কাজেই গভর্নমেন্টের বিপুল ক্ষতি সাধিত হলো। আফগানিস্তানে অনুষ্ঠিত গত দুটি যুদ্ধের মতো আম্বালার যুদ্ধেও গুরুতর পরাজয় বরণ করে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে ফিরে আসতে হলো বটে, কিন্তু কথায় আছে, 'গাধার কিছু করতে না পারো তো গাধার কান মলে দাও।' তেমনি ভাবেই যেন ইংরেজ সরকার আফগান ও উপজাতীয়দের প্রতিকার সাধনে ব্যর্থ হয়ে আসার পর আমাদের, গরীব প্রজাদের উপর নানাভাবে উৎপীড়ন শুরু করে দিলেন।

নয়া যুলুম

যাকে ইচ্ছা খেয়াল খুশীমত শাস্তি দিতে লাগলেন এবং শত শত মুসলমানের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলেন। ১৮৬৩ সালের শেষ ভাগ থেকে দশ বছর পর্যন্ত ভারতে মুসলমানদের উপর কেয়ামতের আযাব চালু রাখলেন। হাজার হাজার মুসলমান শুধু প্রাণের ভয়ে মাতৃভূমি ছেড়ে আরব ও গায়রাহ দেশে হিজরত করে চলে গেল। স্বার্থপর খয়ের খাঁ ও শক্রুর দল মনের সাধ মিটিয়ে চড়ে বেড়াতে থাকে। পত্র পত্রিকা ও খবরের কাগজসমূহে দশ বছর যাবত প্রায় এই ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়।

রাওয়াল পিণ্ডিতে

ধরপাকড়ের সাক্ষ্যপ্রমাণাদি তৈয়ার করার প্রয়োজনে একটি ডিপার্টমেন্ট খোলা হল। যাকে ইচ্ছা গ্রেফতার করা হত এবং যার ইচ্ছা ঘুষ খেতো। যে ঘুষ দিতে অসমর্থ, সামান্য সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হত। চেম্বারলেন সাহেব স্বয়ং ওহাবী ধরপাকড়ের এই নবগঠিত ডিপার্টমেন্টের কমিশনার নিযুক্ত হলেন এবং রাওয়াল পিণ্ডিতে তাঁর হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হলো। অবস্থা এদ্দুর গড়াল যে, দিল্লীর মোহাদ্দেস মওলানা নযির হুসাইন, যিনি প্রকৃতই ছিলেন ব্রিটিশের হিতৈষী, ওয়াহাবীদের গোয়ান্দাগিরি করার অভিযোগে রাওয়াল পিণ্ডিতে আহূত হলেন।

চেম্বারলেনের মৃত্যু ও অতঃপর

কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার আগেই আকস্মিকভাবে চেম্বারলেন মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই বিপজ্জনক দপ্তরের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে কেউ রাজী হলো না। সুতরাং তার অস্তিত্বই লোপ পেয়ে গেল।

বিচার প্রহসন

তবু ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ধরপাকড় পালা চলতেই থাকলো। এপ্রিল মাসে জেলা আম্বালার ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে আমাদের মামলা উপস্থাপিত হলো এবং আমরা কারাগারের মৃত্যুকূপ থেকে আদালতে এসে হাজির হলাম। তখন জানতে পারলাম, আমার ছোট ভাই মুহম্মদ সাইদকে আমার বিরুদ্ধে ও মুহম্মদ শফীর ছোট ভাই মুহম্মদ রফীকে তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে ফাঁসির ভয় দেখিয়ে সাক্ষী নিযুক্ত করা হয়েছে। অনুরূপ প্রক্রিয়ায় আরো পঞ্চাশ ষাটজন লোককেও যাদের অধিকাংশই মোল্লা মৌলভী, আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী নিয়োগ করা হয়েছে। ভাগ্যবিড়ম্বিত এইসব সাক্ষীর অনেকেই আমাদের মুখের দিকে চেয়ে কেঁদে ফেলেছিল। কিন্তু উপায় নেই, সাক্ষ্য না দিলে পুলিশের উদ্যত দণ্ড ছাড়াও ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলার আশংকা। তাঁরা সেসন কোর্টে তাঁদের সাক্ষ্যপর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত কয়েদীদের মতো পুলিশের প্রহরাধীন ছিলেন এবং পুলিশের পক্ষ থেকেই তাঁদের জন্যে উপাদেয় খাদ্য ও পোষাকের ব্যবস্থা করা হত। এমনই সব গর্হিত কাজে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয়ই হচ্ছিল।

পুলিশ-জুলুম

পুলিশ নির্যাতনের কাহিনী তো বেদনাদায়ক। আব্বাস নামে একটি ছেলে, দীর্ঘকাল আমার ঘরে প্রতিপালিত হয়। আদালতে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে মুহব্বতের খাতিরে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা বর্ণনা দিতে কুণ্ঠাবোধ করছিল। সেদিন রাতেই তাকে এমন নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়ে যে, সেসনকোর্টে মোকদ্দমা পেশ হবার আগেই এই নিরপরাধ বালক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু নরহত্যার দায় থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্য পার্সন সাহেব ছেলেটি রোগাক্রান্ত হয়ে মরেছে বলে ঘোষণা করলেন।

প্রথম যেদিন আমাদের আদালতে হাজির করা হয়, আমার ছোটভাইও অনিচ্ছুক সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত হয়ে পুলিশ প্রহরায় কোর্টে এলো। একজন সিপাইয়ের মারফত সে আমাকে জানাল যে, পুলিশ লৌহদণ্ডের সাহায্যে তাকে আমার

বিরুদ্ধে সাক্ষী নিযুক্ত করেছে। প্রহার করে সে মিথ্যা বিবরণ লিপিবদ্ধ করে নিয়েছে। এখন এজলাসে তা অস্বীকার করতে চায়। জবাবে আমি বলে পাঠালাম, আমার মুক্তি পাওয়া না পাওয়া তার বর্ণনার উপর মোটেই নির্ভর করে না। সুতরাং ওর পূর্ব প্রদত্ত বর্ণনা যদি হলফের গৃহীত হয়ে থাকে তাহলে এখন বিপরীত বর্ণনা দিতে গেলে মিথ্যা হলফের দায়ে গুরুতর শাস্তি হয়ে যেতে পারে। এও বোঝালাম, আমি তো আবদ্ধ হয়েই আছি, উপরন্তু সেও যদি আটকা পড়ে, তাহলে বর্ষীয়সী মা দুঃখের পর দুঃখ সইতে না পেরে ইন্তেকাল করতে পারেন। সুতরাং তার পূর্ব প্রদত্ত বর্ণনার কোন পরিবর্তন না করাই বাঞ্ছনীয়। এতদসত্ত্বেও আমার সম্মুখে যখন এজহার হতে থাকলো তখন সে তার আগের এজহারকে অস্বীকার করে বসলো। ইংরেজ প্রভুরা তার এই বিরুদ্ধ-বর্ণনায় ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেও, বয়সের স্বল্পতার জন্য শাস্তি দিতে পারেনি। শুধু সাক্ষীর তালিকা থেকে নাম কেটে তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিল।

সাক্ষীর সংখ্যাধিক্যের জন্য এক সপ্তাহ পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে একমাত্র এই মামলাই চলতে থাকে। ইংরেজ প্রভুরা আমাদের প্রতি এতই বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন যে, নামায পড়বার অনুমতি প্রার্থনা করলেও তা মঞ্জুর করা হত না। কিন্তু তারা আমাদের নামায বন্ধ করবেন কি রূপে? মামলা চলতে থাকাকালেই তৈয়ম্মম করে বসে বসে ইশারা-ইঙ্গিতে নামায সমাপন করে নিতাম। এক সপ্তাহকাল চলবার পর আমাদের মোকদ্দমা সেশনে সোপর্দ করা হলো।

এ যাবত কাল আমরা পৃথক পৃথকভাবে ফাঁসিগৃহেই বন্দী ছিলাম। মামলা সেশনে দেওয়ার পর আমাদের সকলকেই জেল হাজতে বন্ধ করা হলো। দীর্ঘদিনের একক ও নির্জন বাসের দুঃখ দুর্ভোগের পর সকল বন্ধু একসঙ্গে মিলিত হতে পেরে অত্যন্ত স্বস্তি অনুভব করলাম। আনন্দের আতিশয্যে আমি তো প্রায়ই শেখ সাদীর এই বয়েতটি আওড়াতাম, যার অর্থ– 'অপরিচিতদের সঙ্গে কুসুম কাননে ভ্রমণের চেয়ে বন্ধু মহলে শৃঙ্খলিত পদে বাস করাও শ্রেয়।'

কিছুদিন পর এপ্রিলের শেষ ভাগে সেশন কোর্টে মেজর এডওয়ার্ডস সাহেবের এজলাসে আমাদের মোকদ্দমা উপস্থিত হলো। ওখানেও এক সপ্তাহ পর্যন্ত মোকদ্দমার আয়োজন চলতে লাগলো। মুহম্মদ শফী ও আবদুল করিমের তরফ থেকে ব্যারিষ্টার মিঃ গেডাল নিযুক্ত ছিলেন। তারপর মামলা শুরু হলে, পাটনার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে নিয়োজিত তদ্বিরকারী মওলানা মুহম্মদ হাসান ও মওলানা মুবারক আলী মিঃ প্লুডন নামক আর একজন উকিল নিয়োগ করলেন। ইনি একজন অভিজ্ঞ। বিচক্ষণ ও প্রধান আইনজীবী।

মিঃ প্লুডন তাঁর মুক্তার মালা সই করার জন্যে আমাদের কাছে গেলে মওলানা

আবদুর রহীম, মওলানা ইয়াহহিয়া আলী, ইলাহী বখশ সওদাগর, হুসাইনীদ্বয়, কাজী মিঞাজান, আবদুল গাফফার ও মুনশী আবদুল গফুর প্রমুখ আটজন বিবাদী তাতে স্বাক্ষরদান করলেন। কিন্তু আমি দস্তখত দেইনি। বললাম, 'আমি তো নিজেই উকিল, আমি নিজেই আমার জবাবদিহি করব।'

মওলানা ইয়াহহিয়া আলীও উকিল নিয়োগ করা ও এইভাবে অর্থ অপচয় করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তিনি এমনই তরল ও নির্ঝঞ্ঝাট লোক, অনুরোধ করা হলে তিনি বিনা ওযরে দস্তখত করে দিলেন।

বিচার প্রহসন

সরকার পক্ষের উকিল ও তদবিরকারী ছিলেন মেজর উনকফিল ও মিঃ পার্সন। অপরপক্ষে দশজন বিবাদীর তরফ থেকে দুইজন উকিল নিয়োগ করা হয়েছিল এবং আমি স্বয়ং আমার জবাবদিহি করছিলাম। যখন কোন সাক্ষীর বর্ণনা আরম্ভ হত, তখন প্রথমে সেশন জজ তা লিখতেন ও স্বয়ং সওয়াল জেরা করতেন। তারপর আসত সরকারী উকিল এবং তারও পরে বিবাদীদের উকিলের সওয়াল জেরার পালা। সর্বশেষে আমি আমার সওয়াল জেরা সম্পন্ন করতাম। যেহেতু আমি এই মামলা সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা ওয়াকিফহাল, সাক্ষীদের সকলের অবস্থা, জ্ঞান ও যোগ্যতা সম্বন্ধে সুপরিচিত, ওকালতি সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিলাম এবং সওয়াল জেরার কৌশলও অন্যের তুলনায় ভাল ছিল, সেজন্যে অধিকাংশ সাক্ষীই আমার প্রশ্নবানে জর্জরিত হয়ে দোহাই দোহাই করতো। এই মোকদ্দমায় সর্বসাধারণের জন্য আদালত খোলা থাকতো। তাই, বহুসংখ্যক দেশীয় ওদেশীয় ইংরেজ দর্শক এই বিচার প্রহসন দেখার জন্যে ভিড় করতেন। আম্বালা জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে দুইজন হিন্দু ও দুইজন মুসলমান ভদ্রলোক প্রসেসররূপে আহূত হয়েছিলেন। উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্তির পর বিবাদীদের জবানবন্দী তলব করা হল। দশজন আসামীর জবাব লিখিতভাবে তাঁদের উকিল দাখিল করলেন। অতঃপর সেশন জজ বাহাদুর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন– 'বল, তোমার কি বলবার আছে।'

আমি সরকার পক্ষের প্রদত্ত প্রমাণপঞ্জীর প্রতিবাদ করে নেহাৎই যুক্তিপূর্ণ ও বিস্তারিতভাবে আমার কৈফিয়ৎ লিখিয়ে দিতে লাগলাম। কিছুক্ষণ লেখার পর জজ সাহেব রাগে গর গর করে বললেন– 'এই জবাবে তোমার কোনই লাভ হবে না। বরং অপরাধ স্বীকার করে আদালতের অনুগ্রহ চেয়ে তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।'

শত্রুর মুখে এই নীতিকথার সবক পেয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম এবং

পরক্ষণেই বললাম, 'আমি শুধু ন্যায়বিচার পেতে চাই। কিন্তু দেখছি, আপনার কাছে তা পাবার কোন আশাই নেই।'

আমি আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্য দশ বার জন সাফাই সাক্ষী হাজির করতে চাইলাম। কিন্তু তা মঞ্জুর করা হল না। তারপর ১৮৫৪ সালের ২রা মে রায় প্রদানের তারিখ ধার্য হল। সেদিন আমি নিজেই আমার সাক্ষীদের উপস্থিত করলাম। কিন্তু এখনও তাদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হল না। মুহম্মদ শফী প্রমুখ অন্যান্য বিবাদীর অধিকাংশের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য দেওয়া হল। কিন্তু সমস্তই নিরর্থক। কে কার কথা শোনে? বরং মুহম্মদ শফীর পক্ষ থেকে তাঁর সরকার-হিতৈষণা, তাঁর প্রতি শুভেচ্ছা ও নিজের প্রশংসিত কর্মজীবনের প্রমাণস্বরূপ যে শতাধিক সার্টিফিকেট দাখিল করা হলো, তার উত্তরেও বিদ্বেষ বহ্নি জর্জরিত জজ বাহাদুর মন্তব্য লিখলেন যে, এ সকল সার্টিফিকেটের প্রতিটি ছত্র অকাট্যভাবে মুহম্মদ শফীকে দোষী, অপরাধী ও দণ্ডিত হবার যোগ্য বলে প্রমাণ করেছে।

আমাদের যোগ্য ও প্রবীণ উকিল প্লুডন সাহেব বহু আইনগ্রন্থ ও নযীরের সাহায্যে যে জবাব তৈরী করেছিলেন তা এই 'মুলকা ও ছাতিয়ানা প্রভৃতি স্থান–যেখানকার যুদ্ধে সাহায্য প্রেরণ করার দায়ে এরা অভিযুক্ত বৃটিশ এলাকার বাইরে অবস্থিত। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারা মতে, 'যুদ্ধ, সম্রাজ্ঞী এবং বিদ্রোহ' শব্দগুলো ভারত সরকারের এলাকা-বহির্ভূত স্থানে সংঘটিত কোন যুদ্ধের প্রতি প্রযোজ্য নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারার খ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, জায়েদ ভারতের অধিবাসী হয়ে যদি সিংহলে অনুষ্ঠিত বিদ্রোহে বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে সিংহল সম্রাজ্ঞীর এলাকাভুক্ত রাজ্য বিধায় সম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হবে। কিন্তু এখানকার ঘটনা তা নয়। সুতরাং এই ধারামতে এদের শাস্তি হতে পারে না।'

সেশন জজ ও অন্যান্য ইংরেজরা এই যুক্তিতে একদম নিরুত্তর হয়ে গেলেন। তাঁরা 'হাঁ-হাঁ, ঠিক-ঠিক' বলা ছাড়া আর কোন জবাব খুঁজে পেলেন না। এই মামলায় আমাদের প্রতি ইংরেজদের আক্রোশটাই ছিল মুখ্য। সেজন্য প্রথম থেকে তারা আইন-কানুনকে নির্বাসন দিয়ে রেখেছিলেন। এখন আমাদের উকিলের জবাবে, নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেয়ার গোপন অভিপ্রায়ে কিছুদিনের জন্য মামলার সমাপ্তি ঘোষণার কাজ স্থগিত রাখলেন। গভর্নর জন লরেন্স ও আরো অনেক উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে আমাদের নিধনযজ্ঞে পাঠাতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের পরামর্শ চলতে লাগলো। ভাগ্যান্বেষীর দল এদেরকে আগে

থেকেই বুঝিয়ে রেখেছিল এই লোকগুলোকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে ত্রাস সঞ্চার করে ওহাবীদেরকে ভারতভূমি থেকে সমূলে ওপড়াতে না পারলে ভারতের বুকে বৃটিশ গভর্নমেন্টের টিকে থাকাই অসম্ভব হবে। এই যুক্তির পর আইন মান্য করবার আর কোন কারণ ছিল কি?

রায়

যাহোক দীর্ঘদিন স্থগিত থাকার পর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২রা মে তারিখে এই মোকদ্দমার শেষ অধিবেশ হল। জজ সাহেব গভর্নর বাহাদুরের ইঙ্গিতক্রমে তাঁর মন্তব্য ও মামলার রায়, তথা দণ্ড বিধানের ফতোয়া ঘরে বসেই লিখে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি সেদিন এজলাসে বসে প্রথমেই চারজন প্রসেসরকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা এই মামলা আগাগোড়া শুনেছেন। এখন নিজ নিজ অভিমত লিখিতভাবে দাখিল করুন।

আমি লক্ষ্য করছিলাম, চারজন প্রসেসরই আমাদের দিকে তখনো পর্যন্ত তাকিয়ে আছেন। তাঁদের চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত। তাঁরা মনে মনে আমাদের মুক্তি কামনাই করছিলেন। কিন্তু জজ সাহেব ও কমিশনারের রায় যখন আমাদের শাস্তিপ্রদানের অনুকূলে দেখা গেল, তখন ভীত হয়ে তাঁরাও আমাদেরকে দোষী বলে অভিমত লিখে দিলেন। জজ সাহেব আইনগত এই সুবিধা লাভ করে টেবিলের ওপরে রাখা পূর্ব লিখিত রায়টাই পড়তে শুরু করলেন। তাতে আমাদের উকিল প্লুডন সাহেবের যুক্তিপূর্ণ কৈফিয়তের এলোমেলো জবাব ছিল। সর্বপ্রথম তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন– তুমি খুব জ্ঞানী শিক্ষিত আইনজ্ঞ ও শহরের একজন নেতৃস্থানীয় অবস্থাপন্ন লোক। কিন্তু তুমি তোমার যাবতীয় জ্ঞান ও আইনগত পারদর্শিতা গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধাচরণে ব্যবহার করেছো। তোমারই মারফত সীমান্তে সরকার-বিরোধী যুদ্ধে অর্থ ও লোক প্রেরিত হত। তুমি সরকারের বিরুদ্ধাচরণকারী এই সত্যকে অস্বীকার করা ছাড়া ভুলেও কোনদিন সরকারের মঙ্গল কামনা করোনি। সুতরাং তোমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হবে এবং তোমার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত হবে। তোমার মৃতদেহ তোমার আত্মীয় স্বজনদের হাতে দেওয়া হবে না। বরং নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে তা জেলখানার গোরস্থানে পুঁতে রাখা হবে।

আমার জবাব

পরিশেষে তিনি এই বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন, আমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে দেখলে তিনি পরম পরিতুষ্ট হবেন। তাঁর গোটা বিবৃতিটা আদ্য পান্ত নীরবে শুনে গেলাম। কিন্তু ঐ শেষ উক্তিটির পর আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। আমি জবাব দিলাম, প্রাণ দেওয়া নেওয়া খোদার ইচ্ছা। তাতে আপনার কোন হাত নেই। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে আমার মৃত্যুর পূর্বে আপনাকেই ধ্বংস করতে পারেন।

এই সমুচিত জবাবে জজ সাহেব ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়লেন। কিন্তু ফাঁসির হুকুম দেওয়ার অতিরিক্ত তিনি আর কি করতে পারেন? যতটুকু ক্ষমতা তার হাতে ছিল, তা তো প্রয়োগ করেই ফেলেছেন। আমার সেদিনকার ঐ মুখনিঃসৃত উক্তি এমন একটি ভবিষ্যৎ বাণী ছিল যে, আমি আজ পর্যন্ত সুস্থভাবে জীবিত আছি। আর জজ সাহেব তাঁর হুকুম দেয়ার কিছু দিন পরেই নিতান্ত আকস্মিকভাবেই চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। আমার তখনকার মানসিক অবস্থা বেশ স্মরণে আছে। ফাঁসির হুকুম শোনামাত্র এতই আনন্দিত হয়েছিলাম যে সপ্তরাজ্যের রাজত্ব পেলেও এমন লাগত না। মৃত্যুদণ্ডের রায় শোনামাত্র আমার চোখের সামনে বেহেশতের দরওয়াজা খুলে গেল। আমি হুরদের আনাগোনা প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম।

তিন জনের ফাঁসি আট জনের দ্বীপান্তর

www.boighar.com

আমার পরে মওলানা ইয়াহহিয়া আলী সাহেবকে, তাঁর পরে মুহম্মদ শফীকে এবং তারপর পালাক্রমে আটজন আসামীর প্রত্যেককেই শাস্তির হুকুম শুনিয়ে দিলেন। তন্মধ্যে আমি, মওলানা ইয়াহহিয়া আলী ও হাজী মুহম্মদ শফী– এই তিনজনকে ফাঁসি; অবশিষ্ট আটজনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম দিলেন। শেষোক্তদের যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশও প্রদান করলেন। মওলানা ইয়াহহিয়া আলী সাহেবকেও অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। কিন্তু মুহম্মদ শফীর মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন। সেদিন পুলিশ ও তামাশা দর্শনেচ্ছু নর-নারীতে জেলা আম্বালা কোর্টের বিশাল প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। হুকুম শোনামাত্র ক্যাপ্টেন পার্সন সাহেবের অধীনে শতাধিক পুলিশ আমাদেরকে ঘিরে ফেলল। আদালত প্রাঙ্গণ থেকে বার হওয়ার সময় পার্সন সাহেব আমার কাছ ঘেঁষে উপহাস করে বললেন– তোমার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, তোমার কাঁদা উচিত অথচ তুমি

এত উৎফুল্ল কেন?

চলতে চলতে জবাব দিলাম, সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত শাহাদত লাভের গৌরব অর্জন করেই আমি আজ এত আনন্দিত। তুমি কাফের, তা বুঝবে কেমন করে?

এখানে বলে রাখা দরকার, ক্যাপ্টেন পার্সন সাহেব জজ বাহাদুর এডওয়ার্ডস অপেক্ষাও অধিকতর মুসলিম বিদ্বেষী। তিনি এই মোকদ্দমার প্রথম থেকেই আমাদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে আসছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ আমার লেখনি বর্ণনা করতে অসমর্থ। আল্লাহর বিচারনীতি ধীর ও মন্থর হতে পারে, কিন্তু সত্যিকার ন্যায়বিচারক তিনি। আমার শাস্তি হওয়ার কিছুদিন পরেই এই নরপিশাচটি উন্মাদ হয়ে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে করতে জাহান্নামের পথে চলে গেল।

সেদিন আদালত কক্ষ থেকে আমাদেরকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়ার পথে অগণিত দর্শক আমাদের ফাঁসি দেওয়ার হুকুমের কথা শুনে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুপাত করছিল। কেউ ভাবলো এ খোদার ইচ্ছা, আর কেউ কেউ বা অদৃষ্টের লিখন। শেষ বারের মতো আমাদের চেহারা দেখবার জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহুলোক রাস্তার দুইপাশ ধরে জেলখানার দরওয়াজা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল। জেল গেটে পৌঁছামাত্র পুলিশ আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ সমস্তই খুলে নিয়ে তার বদলা গৈরিক বসন পরতে দিল। আমাদের তিনজন ফাঁসির আসামীকে পৃথক পৃথকভাবে তিনটি ফাঁসির কক্ষে আবদ্ধ করা হলো এবং বাকী আট জনকে জেলখানার অন্যান্য কয়েদীর সঙ্গে একত্র করে দেওয়া হল। দোসরা মে তারিখের রাত্রিতে সেই সংকীর্ণ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দী হয়ে এক রাত্রেই জাহান্নামের নমুনা বুঝতে পারলাম। পরদিন সকালবেলা ঐ জাহান্নামের বাইরে রাত্রিযাপন করবার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে জেল কর্মচারীদের কাছে আমাদের গত রাত্রির দুর্দশার কথা বর্ণনা করলাম। কিন্তু প্রভুদের ভয়ে সকলেই বিমুখ হয়ে ফিরে গেল। তারা জেলখানা থেকে বের হতে না হতেই তাদের সম্মুখেই একটি তার বার্তা এসে পড়লো। লেফাফা খুলে দেখা গেল, তাতে পরিষ্কারভাবে আদেশ দেওয়া আছে, এই তিনজন ফাঁসির আসামীকে রাতের বেলায় যেন বাইরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শুতে দেওয়া হয়। তারা কেউ অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে রাজী হয়নি। কাজেই এটা অপ্রত্যাশিত আশীর্বাদস্বরূপ। জেল কর্মচারীরা তৎক্ষণাৎ আমাদের তা জানিয়ে দিল।

ফাঁসির হুকুম রদ

চীফ কোর্টে মোকদ্দমা

বেশ ধুমধামের সঙ্গে আমাদের তিনজনের জন্য তিনটি ফাঁসি কাষ্ঠ ও তাদের রেশমি রশি তৈরী হয়ে গেল। ওদিকে ফাঁসির আদেশের অনুমোদন নেওয়ার জন্য মোকদ্দমার সমস্ত নথিপত্র পাঞ্জাবের চীফ কোর্টে পাঠান হলো। আমাদের উকিল মহোদয়রা পারিশ্রমিক কিছু বেশি নিয়ে মওলানা মুহম্মদ হাসান, মওলানা মুবারক আলী, আমার ভাই সাইদ, মুহম্মদ শফীর পুত্র আবদুর রহমান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সমভিব্যাহারে উচ্চ আদালতে উপনীত হলেন। মেজর উনকফিল সরকারী উকিল ও তদবিরকারকেরা আগেই সেখানে পৌঁছেছিলেন। এদিকে আমি হুকুমের নকল বার করে জেলখানায় বসে বসে খুব যুক্তিপূর্ণ একটি আবেদন পত্র তৈরী করলাম এবং তা জেল সুপারের মারফত চীপ কোর্টে পাঠিয়ে দিলাম। চীফ কোর্টেও এক মোকদ্দমার ব্যাপারে সগৌরবে কয়েকটি অধিবেশন হয়ে গেল। ওখানেও আমাদের উকিল মিঃ প্লুডন বহু যুক্তিপ্রমাণে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করলেন যে, ১২১ নং ধারায় এই সকল বিবাদীকে কখনই অভিযুক্ত করা যেতে পারে না। অভিযুক্ত করলে তা সরাসরি বেআইনী হবে। অন্য কোন ধারায় তাদের উপর অভিযোগ আনা হোক। তদানীন্তন জুডিশিয়াল কমিশনার মিঃ রবার্ট ফাস্ট এই আইনসঙ্গত যুক্তি প্রমাণগুলো এজলাসে সর্বসমক্ষে স্বীকার করে নিলেন।

কিন্তু এখানেও আগের মতোই, বোঝাপড়া করার জন্য মামলাটি আবার কিছুদিন মুলতবী রাখা হলো। ইতিমধ্যে সকল সংবাদপত্র আপন আপন অভিমত প্রকাশ করে বলল, এদের মুক্তি পেতে আর দেরী নেই, হুকুম শোনাবার অপেক্ষামাত্র। আমার পরিবারবর্গেরও আমার মুক্তি সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, জেল থেকে বাইরে আসার জন্য তাঁরা আমাকে নতুন জামা-কাপড় প্রেরণ করেছিলেন।

চীফ কোর্টেও আমাদের মামলা দীর্ঘদিন ধরে পড়ে রইল। আমাদেরকে বেআইনীভাবে আটক করায় খুব সম্ভব বিলাতী কর্তাদের পরামর্শ গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ফাঁসির হুকুম শোনাবার তারিখ ২রা মে থেকে ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৮৬৪) পর্যন্ত আমরা ফাঁসিগৃহেই আবদ্ধ রইলাম।

আমাদেরকে ফাঁসিমঞ্চে আরোহণ করাবার সমস্ত আয়োজন জেল কর্মচারীরা চালিয়ে যেতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইংরেজ দর্শকদের কৌতূহলের বস্তুতে পরিণত হলাম। প্রতিদিন শত শত ইংরেজ নরনারী আমাদের দেখবার জন্য

ফাঁসিগৃহের সম্মুখে ভীড় জমাত। কিন্তু এখানে ফাঁসির কয়েদীদের ব্যতিক্রম মানে আমাদেরকে প্রফুল্ল দেখে তারা অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করত, তোমাদের ফাঁসির দিন আসন্ন অথচ তোমরা এত খুশী কেন?

জবাবে শুধু এইটুকু বলতাম, আমাদের ধর্মে খোদার পথে এই রূপ অবিচারে মৃত্যুবরণ করার ফলস্বরূপ শাহাদতের মর্যাদা লাভ করা যায়। সুতরাং শহীদ হওয়ার গৌরবেই আমরা এত আনন্দিত।

সেদিন বকরা ঈদ। আমরা তখনও আমাদের বধ্যভূমির তীর্থযাত্রার অপেক্ষায় ফাঁসিগৃহে দিন গুনছি। মনে হলো, আজ মুসলমানগণ প্রাণভরে কোরবানীর গোশত আহার করছেন। শান-ই-এলাহী, এমন সময় পোলাও কোর্মা কালিয়া কাবাব কোরবানীর দিনের সমস্ত উপাদেয় খাদ্য অজ্ঞাত স্থান থেকে ঐ জেলখানার মধ্যেই আমাদের জন্য এসে উপস্থিত হল। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সেগুলো খেয়ে আমরা আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া আদায় করলাম।

প্রহরীদের সংকল্প

আরেকদিনের ঘটনা। রাত্রে আমরা তিনজন ফাঁসির আসামী আমাদের ফাঁসিকক্ষে বসে গল্প করছিলাম। ঠিক সে সময় আমাদের প্রহরীরা গোপন সিদ্ধান্তক্রমে আমাদের তিনজনকেই ঐ মুহূর্তে অন্ধকারের মধ্যে পলায়ন করে প্রাণ বাঁচাবার পরামর্শ দিলেন। কর্তব্যে অবহেলার অপরাধে যা শাস্তি হতে পারে, তা তারা নিজেরা ভোগ করবেন। আমরা তাঁদের এই সাহস ও সদিচ্ছার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম। কিন্তু জানালাম, আল্লাহ্ পাক ইহকালে পরকালে আপনাদেরকে এই সদিচ্ছার জন্য বদলা দান করবেন, কিন্তু আমরা পালাব না। তাঁর যেদিন মর্জি হবে আমরা আপনা-আপনিই মুক্তি পাব। আরো জানালাম, আমি পলায়ন করি এই ইচ্ছা তাঁর নেই। কাজেই আলীগড় পর্যন্ত পালিয়ে গিয়েও বাঁচতে পারিনি– গ্রেফতার হয়ে এসেছি। সুতরাং বন্ধুগণ! তার পুনরাবৃত্তি আর সম্ভব নয়।

কবি বলেছেন– বন্ধু আমার গলায় রশি বেঁধে দিয়েছেন, এখন তিনি আমাকে যেখানে ইচ্ছা টেনে নিয়ে যেতে পারেন।

মিঞাজান সাহেবের ইন্তেকাল

আমরা যখন ফাঁসিগৃহে বন্দী তখন কুমারখালি নিবাসী কাযি মিঞাজান সাহেব পীড়িত হয়ে হাসপাতালে গেলেন। সেখানে থেকেই তিনি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ

করবার জন্যে মাঝে মাঝেই আসতেন। তাঁর ইন্তেকালের দুই একদিন পূর্বে তিনি স্বপন দেখেছিলেন, মণিমুক্তা খচিত একটি সিংহাসন আকাশ থেকে নেমে এসে তাকে ঊর্ধলোকে নিয়ে গেল। পর তিনি পরলোকগমন করেন। আমাদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ অথচ খুব ধৈর্য্যশীল ও দৃঢ়চিত্ত ছিলেন। জেলখানার গোরস্থানে তাঁকে অন্তিম শয্যায় শায়িত করা হলো।

মায়ের মৃত্যু

আমি ফাঁসিঘরে বন্দী থাকাকালীন আর একটি ঘটনা। এক রাত্রে থানেশ্বরে আমার মাকে সর্পে দংশন করে। শুনেছি তিনিও অবিচলিত ঈমানের পরিচয় দিয়েছেন। অনেকেই তাঁকে শেরেকী তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে বিষ নামাবার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু তিনি রাযী হননি।

ভবিষ্যদ্বাণী

এখানে একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা তখনো ফাঁসিকক্ষে আবদ্ধ। পরম করুণাময় তাঁর অনুগ্রহপ্রাপ্ত কোন বুজুর্গ ব্যক্তিকে জানালেন যে, আমাদের ফাঁসিদণ্ড রহিত হয়ে যাবে এবং তৎপরিবর্তে হবে দ্বীপান্তর আর আমি সেখান থেকে জীবিতাবস্থায় পরিবার পরিজনের মধ্যে আবার ফিরে আসবো। এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রায় দুই মাস পর আমাদের ফাঁসিদণ্ডের আদেশ রহিত হয়েছিল।

এই ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক ফাঁসিদণ্ড রহিত হওয়া ও কালাপানি যাওয়ার প্রতি আমাদের কিন্তু দৃঢ় আস্থা জন্মে গিয়েছিল। এমন কি আমি আমার ছোট ভাই ও কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে সঙ্গে পত্র মারফত এই আশার বাণী জ্ঞাপন করেছিলাম। কিন্তু যেহেতু গোটা বৃটিশ সাম্রাজ্য সমবেতভাবে তখন আমাদের ফাঁসি দেবার জন্য বদ্ধপরিকর এবং উক্ত আদেশ রদ হওয়ার আপাতত কোন লক্ষণও ছিল না, কেউই এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর আস্থা স্থাপন করতে পারেননি। কারণ, তখন এমনই সংকটময় সময়, কেউ আমাদের সপক্ষে একটি বাক্য উচ্চারণ করলেও অনায়াসে গ্রেফতার হয়ে যেত। এমনি সামান্য সামান্য কারণেই বহুলোক গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছিল। কারো ঘরে যদি আমার কিছু আসবাবপত্র পাওয়া যেত, অথবা আমার বাড়িঘর সব কিছু নিলাম ও বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর কেউ যদি আমার পুত্র-কন্যাদের একটু জায়গা দিত, তাহলে আর রক্ষা ছিল না। তখন রোম সম্রাটও আমার পক্ষ হয়ে ইংরেজদের নিকট সুপারিশ করলে তা কিছুতেই মঞ্জুর হত না। এই পরিবেশের মধ্যে ফাঁসির হুকুম রদ হওয়া একান্তই অসম্ভব ও কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল।

ফাঁসির হুকুম দ্বীপান্তরে পরিবর্তিত

এখন সেই মোকাল্লেবুল কলুব (অন্তর পরিবর্তনকারী) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কার্যকলাপ লক্ষ করুন। অসংখ্য ইংরেজ নর-নারী আমাদেরকে ফাঁসি কক্ষে হর্ষোৎফুল্ল দেখতে পেলে সমস্ত ইংরেজ নর-নারী মহলে এটি একটি আলোচনার বিষয় হয়ে পড়ল। এ অবস্থায় আমাদের পরম শত্রুরারও ভাবতে লাগলো, আমাদের কাম্য এই শাস্তি দেওয়া উচিত হবে কিনা? বরং কালাপানি পাঠিয়ে দুঃখ-দুর্দশার চাপে নিষ্পেষিত করে আমাদের তিলে তিলে হত্যা করাই যেন বাঞ্ছনীয়। আমরা দেখতে পেলাম সেই ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক আম্বালার ডিপুটি কমিশনার সাহেব ১৮৬৪ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে অকস্মাৎ আমাদের ফাঁসিকক্ষে উপস্থিত হলেন এবং চীফ কোর্টের রায় পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন– 'যেহেতু তোমরা ফাঁসিমঞ্চে আরোহণ করাকে অত্যন্ত প্রিয় বস্তু মনে কর এবং তা শাহাদত বলে গণ্য করে থাকো, সেহেতু গভর্নমেন্ট তোমাদের এই কাম্য শাস্তি তোমাদেরকে প্রদান করবেন না। সুতরাং ফাঁসিদণ্ড যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পরিবর্তিত হয়ে গেল।' পর মুহূর্তে আমাদেরকে ফাঁসিঘর থেকে বাইরের ব্যারাকে স্থানান্তরিত করা হল এবং অপরাপর কয়েদীর সঙ্গে একত্র করে দেওয়া হল। তারপর জেলখানার বিধানমতে কাঁচি দিয়ে আমাদের মাথার চুল, দাঁড়ি ও গোঁফ ছেঁটে লোমছাড়া ভেড়া বানিয়ে দিল। তখন দেখতে পেলাম মওলানা ইয়াহহিয়া আলী সাহেব তাঁর কর্তিত শ্মশ্রুর লোমগুলো হাতে নিয়ে দুঃখ করে বলছেন, আফসোস করো না, তুমি খোদার রাস্তায় বন্দী হয়েছো এবং তারই জন্য কাটা পড়েছ।

ভাগ্যের পরিহাস

কুদরত-ই-এলাহীর আরো একটি উল্লেখযোগ্য কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা। রাজদ্রোহিতার গুরুতর অপরাধের দরুন আমার জন্য একটি বিশেষ ধরনের খুব মজবুত ফাঁসিকাষ্ঠ ও ফাঁসি দেওয়ার জন্য রেশমী রশি তৈরী হয়েছিল। কিন্তু তকদিরের খেলা– আমার ফাঁসির হুকুম তো রদ হয়ে গেল, ইতিমধ্যে হত্যার দায়ে একজন গোরা ফাঁসির হুকুমপ্রাপ্ত হলো। এবং আমার জন্যে করা ফাঁসির সমস্ত আয়োজন বেচারা ইংরেজের ভাগ্যে জুটে গেল। যাই হোক, ফাঁসির হুকুম রদ হওয়ার পর আমাদের তিনজন আসামীকেই অন্যান্য কয়েদীর সঙ্গে কায়িক পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত করা হলো।

নবী বকশ দারোগা, রহিম বকশ নায়েব। দারোগা ও অন্যান্য কর্মচারীরা আমাদের প্রতি সদয় ছিলেন। কিন্তু সুপারের ভয়ে তিনজনকেই ঢেঁকিতে কাগজ কুটবার কাজে নিয়োগ করলেন। জেলখানার ভেতরে এটাই ছল সবচেয়ে কঠিন কাজ। কিছুক্ষণ ঢেঁকি চালাবার ফলে আমার পা দু'খানা অবশ হয়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই রিলিফ জেল সুপার ডাঃ কেটসন ঐ কাগজ ঘরে প্রবেশ করলেন। আমাদেরকে ঢেঁকি চালাবার মতো কঠিন কাজে রত দেখে তিনি দারোগার উপর ভীষণ চটে গেলেন। মওলানা ইয়াহহিয়া আলী ও মুহম্মদ শফীকে সুতা খোলাবার মতো সহজ কাজের ভার দিলেন। আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিলেন এবং যেখানে কাগজ বাছাই করা হচ্ছিল, হাত ধরে আমাকে সেই নর্দমার ধারে নিয়ে বললেন– এ সমস্তই অফিসের বাতিল কাগজ। তুমি এগুলো পড়ো, চিত্তবিনোদন হবে, আর কাগজগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে নর্দমায় ফেলতে থাক, এই তোমার কাজ। তোমার হাতের লেখা কাগজও নিশ্চয় এতে থাকবে।

www.boighar.com

আল্লাহর ফযল ও করমে আমার পরিশ্রম অবসর বিনোদনে পরিবর্তিত হয়ে গেল।

সারাদিন এইভাবে কাটাবার পর রাত্রে আমরা সকলে ব্যারাকে নিদ্রা যেতাম।

জেলখানায় গিয়ে দেখতে পাই, কয়েদীরা শুধু ডালরুটি ও সপ্তাহে দুই তিন দিন মাত্র তেলে পাক করা তরকারী পেয়ে থাকে। ইংরেজ আমলের গোশত দুধ দৈ ঘি কেউ চোখেও দেখতো না। খোদা পাকের অনুগ্রহ দেখুন, আমাদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবের জেল সমূহের ইনস্‌পেকটর জেনারেলের নির্দেশে পাঞ্জাবের সমস্ত কয়েদী গোশত ঘি ও দৈ পেতে লাগলো। কয়েদীরা ভাবত, আমরাই এর নিমিত্ত। তাই তারা আমাদের জন্য দোয়া করত। মজার ব্যাপার এই যে, আমরা যদ্দিন পাঞ্জাবের জেলসমূহে বাস করছিলাম ততদিন সমস্ত জেলেই এরূপ খাদ্য নিয়মিত সরবরাহ করা হচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, আমাদের আন্দামান যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্তই একদম বন্ধ হয়ে গেল। উপরন্তু কয়েদীরা গমের রুটির বদলে বজরার রুটি পেতে লাগলো।

আম্বালা জেলে থাকতেই এক ভীষণ সক্রামক জ্বরের কবল থেকে কোনক্রমে বেঁচে গেলাম।

এখানে দুই চারটি ব্যক্তিগত পার্থিব কথা বলে নিই। ১৮৬৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর রাত্রিতে আমার বাড়ি তল্লাশী হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত আমি হাজার হাজার টাকার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক ছিলাম। আমার গাড়ি ছিল; ঘোড়া ছিল, চাকর-নওকর ছিল এবং বহু সংখ্যক প্রজা ছিল। আমি ছিলাম এই শহরের

একজন নামকরা লোক। কিন্তু ফেরার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমার মান সম্মান ও প্রতিপত্তি ধুলোয় বিলীন হয়ে গেল। আমার ফেরার হওয়ার কারণে অথবা আমি ইংরেজদের অত্যধিক ক্রোধভাজন হয়ে পড়ায়, মোকদ্দমা শেষ হবার আগেই গভর্ণমেন্ট আমার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি ক্রোক করে নিয়েছিল। পরদিন আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে কেউ বারান্দায়ও দাঁড়াতে দেয়নি। এক রাত্রের মধ্যেই আমার সমস্ত ধন-সম্পদ অন্যের হাতে চলে গেল। ক্রোক হওয়ার আগে আমার উত্তরাধিকারীদের এতটুকু সুযোগ ঘটল না যে তারা নিজ নিজ অংশ পৃথক করে নিতে পারে। আমার ছোটভাই যে অর্ধেক অংশের মালিক, আমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবার হুকুম বের হওয়ার পূর্বে তার দাবী উত্থাপন করেছিল। তাতে শুধু একটি কামরা ছেড়ে দিল মাত্র। বাকী সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম করে নিল। ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আমার নিজের অংশের যাবতীয় সম্পত্তি আমি আমার স্ত্রীর নামে দেনমোহরের বিনিময়ে এক বায়নাপত্র লিখে রেখেছিলাম। কিন্তু উক্ত দলিল পেশ করা হলেও ক্রোধে ও হিংসায় অন্ধ হয়ে তার কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। বরং আমার স্ত্রীকে দুইটি দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ হাত ধরে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল।

মিথ্যা সাক্ষী

মীর মজিব উদ্দীনের কারসাজি

পাঞ্জাবের চীফ কোর্টে আপীল রুজু থাকার সময় আমাদের উকিল প্লুডন সাহেব আমাকে লিখে জানালেন যে, ইংরেজরা ভাবছেন আমরা যদি আপীলে মুক্তি পাই তো ভাল। নইলে মওলানা আহমদুল্লাহ সাহেবকেও তাঁরা গ্রেফতার করবেন। আমাদের আপীল না-মঞ্জুর হয়ে গেল। সুতরাং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা মওলানা আহমদুল্লাহ সাহেবের বিরুদ্ধে আমাদের এগারজন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্য থেকে কাউকে শিখিয়ে পড়িয়ে মিথ্যা সাক্ষী খাড়া করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। মীর মজিব উদ্দিন তহসীলদার, যিনি ঘুষ নেয়ার দায়ে আম্বালা জেলে আটক ছিলেন ও আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, ইংরেজরা তার সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হলেন, তিনি যদি এই এগারজনের মধ্যে থেকে কাউকে ফুসলিয়ে ও বুঝিয়ে পড়িয়ে মওলানা আহমদুল্লাহ সাহেবের বিরুদ্ধে সাক্ষী প্রস্তুত করে দিতে পারেন তাহলে তাঁকে মুক্তিদান ও পুনরায় তহসিলদার পদে বহাল করা হবে। নিজ অবস্থার উন্নতির আশায় তিনি তাঁর কার্যক্রম শুরু করে দিলেন। কিন্তু যখনই তাঁর প্রচেষ্টার খবর আমাদের কানে আসত, আমরা আমাদের সঙ্গীদেরকে বুঝাতাম,

বন্ধুগণ, আমাদের দুনিয়া তো বরবাদ হয়েই গেছে, বাকী আছে শুধু ধর্ম। মিথ্যা সাক্ষী সেজে যদি তা খুইয়ে বস, তাহলে তোমার দৃষ্টান্ত হবে না ইহকাল না পরকাল।

লাহোর জেলে প্রেরণ

এইভাবে মীর মজিব উদ্দিন সাহেবের সারাদিনের কারসাজি আমাদের এক মুহূর্তের উপদেশেই ব্যর্থ হয়ে যেত। তখন মীর সাহেব তার প্রভুদের বুঝিয়ে দিলেন, যদ্দিন মুহম্মাদ জাফর ও মওলানা ইয়াহহিয়া আলী এখানে আছে, তদ্দিন কাউকে সাক্ষীরূপে পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২২ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আমাদের দুইজন ও মিঞা আবদুল গাফফারকে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হলো। এবং মুহাম্মদ শফী, আবদুল করিম, এলাহী বখশ ও মুনসী আবদুল গফুর প্রমুখ আম্বালা জেলেই রয়ে গেলেন।

চমৎকার! আমার এই জেল থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুহম্মদ শফী ও আবদুল করীম প্রমুখরা সরকারী সাক্ষী সেজে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করলেন। এঁদেরই মিথ্যা সাক্ষে তদানীন্তন আউলিয়া শামসুল ইসলাম মওলানা আহমদুল্লাহ সাহেব ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত অবস্থায় আমাদের আগেই জুন মাসে আন্দামানে উপনীত হলেন।

মোকদ্দমার নথিপত্র ও মুহম্মদ শফীকে দোষী সাব্যস্ত করার প্রমাণাদি আলোচনা করলে পরিষ্কার বোঝা যাবে, কিরূপে আক্রোশের বশবর্তী হয়ে মওলানা শফীকে ফাঁসিদণ্ডে দণ্ডিত ও তাঁর পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। অথচ মাত্র একটি বৎসর সাক্ষী বানাবার অজুহাতে তাঁকে মুক্তি দান করা হলো। অবশ্য এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল, যাতে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি তাঁকে প্রত্যর্পণ করতে না হয়। যদি সে নির্দোষই ছিল বা এক বৎসর পর মুক্তি পাওয়া প্রমাণিত হল, তাহলে ঘটা করে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাঁকে ফাঁসিদণ্ডে দণ্ডিত করার কি কারণ ছিল? আর সত্যই যদি সে গুরুতর অপরাধী ছিল, ও সেশন জজ সাহেবের রায়ের আনুষঙ্গিক প্রমাণাদি নির্ভুল ছিল, তাহলে এক বছর পরেই তাঁকে মুক্তি দান করা হল কেন?

১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ওহাবী গ্রেফতারীর যে সকল মোকদ্দমা চলছিল তন্মধ্যে আমীর খাঁ চামড়ার মার্চেন্ট, মওলানা তবারক আলী, পাবনার অধিবাসী মওলানা আসিরুদ্দীন (জানা যায়, ইনি কলকাতার অধিবাসী এবং পাবনায় গ্রেফতার হন) ও ইসলামপুর নিবাসী ইবরাহিম মণ্ডল সাহেবের মামলাও চলছিল। এই সমস্ত

মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য তৈরী করা হত, অথবা সরকার পরে গোয়েন্দাদেরকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে আহ্বান করা হত। আমি স্বয়ং একজন সাক্ষীর মুখে শুনেছি, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলে তাদেরকে শাসানো হত যে, এই শর্তেই তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। সাক্ষ্য না দিলে পূর্ব ওয়ারেন্টেই আবার গ্রেপ্তার করে তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও কালাপানি প্রেরণ করা হবে।

আম্বালা লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে আমার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা জেলখানার ভেতরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল। তখন রমযান মাস। আমি রোযা ছিলাম। জেলখানার বাইরে একটি কামরার মধ্যে অনেকক্ষণ আমাদের কথাবার্তা চলছিল। পরনে আমার গৈরিক বসন। কম্বলের জামা ও পায়ে লোহার বেড়ী দেখে আমার স্বজনেরা অবাক। অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়ল। আমি তাদেরকে সান্ত্বনা দিলাম এবং ঈমান ও সবরের বিষয় বোঝালাম। দীর্ঘ সোয়া বৎসর পর আমার পুত্র সাদেককে সেদিন দেখলাম। সে এত বড় হয়ে গেছে, প্রথম তাকে চিনতেই পারিনি। তার সঙ্গে এই আমার শেষ সাক্ষাৎ। এই ধরাধামে দ্বিতীয়বার আর তার সঙ্গে মুলাকাত হয়নি।

হ্যাঁ, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারী তারিখে আমরা আম্বালা থেকে লাহোর জেল অভিমুখে রওনা হয়েছিলাম। গৈরিক বসন, কম্বল পরিহিত যোগীর বেশ, হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ীর অলংকার। আমাদের সঙ্গে দুইটি গাড়ী থাকলেও পদব্রজেই চলছিলাম আমরা ত্রিশ চল্লিশ জন কয়েদি। কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাকে গাড়ীতে ওঠান হত। তা ছাড়া সকলেই ঝন ঝন ঝনঝন শব্দে লোহার মল বাজাতে বাজাতে ক্রমাগত হাঁটছি। যা হোক, সোয়া বৎসর পর কারা প্রাচীরের বাইরে, মুক্ত হাওয়ায় পরিভ্রমণ করতে পেরে, রাস্তায় যা ইচ্ছে তাই কিনে খাওয়ার সুযোগ পেয়ে, সর্বোপরি মওলানা ইয়াহহিয়া আলী সাহেবের নিরবচ্ছিন্ন সাহচর্য লাভের আনন্দে এই সফরের দিনগুলো সার্থক হয়ে উঠলো।

মহারাজার বরযাত্রীদল ও আমরা

পথযাত্রার সময় ঘটনাক্রমে পাতিয়ালার মহারাজা হিন্দ সিংয়ের বরযাত্রী দল খুব ধুমধামের সঙ্গে আমাদের আগে আগে দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে যাচ্ছিল। ফেব্রুয়ারী শেষের গোলাপী শীত, তখন সূর্যোদয় হচ্ছিল। একদিকে উদীয়মান সূর্যের আলোকচ্ছটায় বরযাত্রীদের দেহাবরণের সোনাচান্দি ও মণিমুক্তার চাকচিক্য, অন্যদিকে আমাদের বেড়ীর ও হাতকড়ার কৃষ্ণচ্ছটা। একদিকে শাল, কিংখাব ও বনাতের মনোহারিত্ব, অন্যদিকে আমাদের গৈরিক বসন ও কম্বলের সাদা কালোর প্রতিযোগীতা। ওদিকে হাতী ঘোড়ার হুংকার এদিকে বেড়ীর

ঝংকার। মহারাজার বরযাত্রীদল ও আমরা কয়েদীরা যেন পাশাপাশি প্রতিযোগীতা করে চলছিলাম। সে প্রতিযোগীতা মান ও অপমানের, ছোটর সঙ্গে বড়র। তবু দীর্ঘদিন পরে কারাগারের অন্ধ কক্ষ থেকে আমাদের বাইরের আলোকে আসবার আনন্দ বরযাত্রীদের আনন্দের চাইতে কোন অংশে কম ছিল না। আমরা হরিণের মতো নাচতে নাচতে ছুটে ছুটে চলছিলাম। যাদের কাছে কিছু টাকা পয়সা ছিল তারা রাস্তায় ফলমূল কিনে খেয়ে ফুর্তি করতে করতে যাচ্ছিল। লুধিয়ানা, ফুলওয়ার, জলন্ধর, অমৃতসর একে একে পিছনে পড়ে যায়। শেষে আমরা আমাদের শেষ মঞ্জিল লাহোরের শালিমার বাগের সম্মুখে পৌঁছলাম। সেখানে প্রত্যেকেই যার যা খুশী প্রাণভরে খেয়ে নিই। কারণ জেলখানায় প্রবেশ করলে নিয়মিত খোরাক ছাড়া অতিরিক্ত কিছু খেতে পাওয়া অসম্ভব।

বিকেল প্রায় তিনটের সময় আমরা লাহোরে সেন্ট্রাল জেলের সম্মুখে পৌঁছে গেলাম। আমাদের সবাইকে সারিবদ্ধভাবে জেলের দরওয়াজায় বসিয়ে দেওয়া হল। প্রথমত একজন কাশ্মিরী হিন্দু দারোগা এসে আমাদের মোকদ্দমায় আসামীদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করে ও আন্তরিক দুঃখ জানায়। এরপর জেল সুপার ডাঃ গ্রে আবির্ভূত হলেন। সর্বপ্রথম তিনি আমাদের পরিদর্শন করলেন, তারপর রোষভরে হুকুম দিলেন– এদের প্রত্যেকের পায়ে আড়াআড়িভাবে একটি করে লোহার ডান্ডা লাগিয়ে দাও। আদেশ দেওয়া মাত্র লৌহদণ্ড নিয়ে কামার এসে হাজির এবং আমাদের পদযুগলের বেড়ীর সাথে এক একটি একফুট লম্বা সেগুলো স্থাপন করল।

নিছক আক্রোশবশে শুধু আমাদের উপরই এই হুকুম প্রয়োগ করা হলো। সমগ্র জেলখানার ভেতরে আর একটি কয়েদীর পায়েও এই ডান্ডা দেখিনি। এর ফলে উঠাবসা ও চলাফেরা ভয়ানক কঠিন হয়ে পড়ল। রাত্রে পা মেলে শুতে পারা যেত না। জেলখানার মাঝখানে একটি কামরা ও তার চারপাশের প্রাঙ্গণসহ আটটি ব্যারাক। কয়েদীদের কায়িক পরিশ্রমের জন্য একটি কারখানাও ছিল। সাহেব প্রবর আমাদের মোকদ্দমার আসামীদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথক ব্যারাকে আবদ্ধ রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন যেন আমরা পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করতে না পারি। বন্ধু বিচ্ছেদের ব্যথা লৌহদণ্ডের দুর্ভোগ থেকেও গুরুতর ছিল।

সর্বাপেক্ষা কঠিন জায়গা এক নম্বর ব্যারাকে আমার স্থান নির্দেশ করা হলো। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে বিকেল ছটার সময় আদেশ এসে পৌঁছল যে, আম্বালা জেল থেকে আগত সমুদয় কয়েদীকে যেন পৃথকভাবে রাখা হয়। কারণ এরা সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত কারাগার থেকে এসেছে। এদের রোগ যেন এই জেলের

অন্য কয়েদীদের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে। এই নির্দেশক্রমে আমি যেখানে ছিলাম সেই এক নম্বর ব্যারাকে সকলের স্থান করা হলো। সকলে আবার মিলিত হতে পেরে অত্যন্ত খুশী হলাম।

জেলখানার এই নম্বরটি একজন মুসলমান জমাদারের চার্জে থাকায় আমাদেরকে বিশেষ কোন মেহনতের কাজ করতে হয়নি। উপরন্তু সুপার আমাকে সপ্তাহখানেক পরে এই ব্যারাকের মুনশী নিয়োগ করলেন। কিন্তু পায়ের ডান্ডা যেমন ছিল তেমনি রইল। এর ফলে প্রত্যহ ভোরে পরিদর্শনের সময় সুপার সাহেবের সঙ্গে আমাকে হরিণের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হত।

ছন্দলের উদারতা

একদিন রোববারে আমি আমার বিছানায় বসে আছি। সহসা জেল সুপার আমাদের নম্বরে এসে উপস্থিত হলেন এবং এখানকার কয়েদীদের তল্লাশী করবার হুকুম দিলেন। আমার বিছানার তলা থেকে কিছু লবণ বের হল। এইরূপ অপরাধে জেলখানায় বেত্রাঘাত করা হয়। আমি বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়লাম, কি জবাব দেব? এমন সময় ছন্দল নামক একজন মুসলমান কয়েদী, যে আমার সঙ্গেই আম্বালা থেকে এসেছিল ও আমার খেদমত করত, বলে উঠল– হুজুর, এই বিছানা ও লবণ আমার, ওর নয়।

উনি বললেন– তা কেমন করে হয়?

ছন্দল জবাব দিল, আপনি আসবার আগে আমরা দুইজনে একটু বাইরে গিয়েছিলাম। এ সময় হুজুর এসে পড়ায় আমরা দৌড়ে এসে হাজির হই। কাজেই ইনি আমার বিছানায় আর আমি উনার বিছানায় বসে পড়েছি।

এই শুনে সুপার সাহেব হেসে ফেললেন এবং আমাদের দুইজনকেই নম্বরের বাইরে বেত্রাঘাত করার জায়গায় নিয়ে গেলেন। এইরূপ অপরাধে অন্যান্য কয়েদীর বেত দেওয়া শুরু হল। পরিশেষে তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে ছন্দলকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কথা কি সত্য?

ছন্দল বললো, হ্যাঁ হুজুর! ঐ বিছানা ও লবণ আমার, বাকী আপনার ইচ্ছা।

এই জবাবে তিনি আমাদের উভয়কেই রেহাই দিলেন। কিন্তু ছন্দলকে বললেন, তুমি মৌলবীকে বাঁচাতে চাও। আমি তোমাকে মাফ করলাম বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য হুঁশিয়ার থেক।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষভাগে কয়েদীদের এক বিরাট চালান মুলতান পাঠাবার আয়োজন হয়ে গেল। প্রতি দুইজন করে কয়েদীকে একটি

করে হাতকড়ি লাগানো এই আয়োজনেরই একটি অঙ্গ। আমার সঙ্গীটি আমাকে এতটুকু খাতির করল, আমার বাঁ হাতের সঙ্গে ওর ডানহাত বাঁধতে দিল। আমাদের মামলার আমি, মওলানা ইয়াহহিয়া আলী ও মিয়া আবদুল গাফফার শুধু এই তিন জন মুলতান রওনা হলাম।

মওলানা আবদুর রহিম সাহেবকে আমাদের সঙ্গে আম্বালা থেকে পাঠান হয়নি। হয়ত উদ্দেশ্য ছিল, তাঁকে সেখানেই আটক রাখা। আগেই বলেছি, আমাদের আপীল না-মঞ্জুর হবার পর দুইটি কারসাজি শুরু হয়েছিল। তার একটি আগেই বর্ণনা করেছি। দ্বিতীয়টি হল, মুজাহিদ বাহিনীকে ভারতে ফিরে আসার জন্য প্ররোচিত করা। এদেশে তাদেরকে জায়গীর প্রভৃতি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে এবং তাদের কয়েদীদেরও ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এই দ্বিতীয় কারসাজি সফল হয়নি। কারণ ঐ সকল রিক্ত ও সংসারত্যাগীর দল, যারা বৃটিশ সাম্রাজ্যকে দারুল হরব মনে করে, মহাবনের পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছেন। তারা কেমন করে পার্থিব সম্পদের লোভে বা আমাদের মুক্তিলাভের আশায় সংরক্ষিত ও নিরাপদ স্থান ত্যাগ করে আবার দারুল হরবেই ফিরে আসতে পারে? এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেলে আমাদের দুই বৎসর পর মওলানা আবদুর রহীম সাহেবকে আন্দামানে প্রেরণ করা হল।

লাহোর থেকে বিদায়

লাহোর থেকে বিদায় হবার সময় আমাদের একহাতে বিছানাপত্র অন্যহাতে হাতকড়া আর সিপাইরা তাড়া দিচ্ছিল জলদি কর জলদি কর, গাড়ি এসে পড়ল। এইভাবে জেলখানা থেকে অতিকষ্টে ইষ্টিশনে এসে পৌঁছলাম। আমাদের গাড়ীতে উঠিয়ে বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে দেয়া হল। লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত কোথাও দরওয়াজা খোলা হয়নি। জীবজন্তু ও মালপত্রের মতো আমাদেরকে এমনিভাবে বোঝাই করে নিয়ে গেল। অনুমান রাত আটটার সময় মুলতান পৌঁছি এবং ওখানেও ঘাড়ের উপর বিছানা চাপিয়ে অন্ধকারে টানতে টানতে আমাদের জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হল এবং সেই ভুখা অবস্থাতেই পশুবৎ জেলে খোঁয়ারে নিয়ে আবদ্ধ করল। আমি আর মওলানা ইয়াহহিয়া আলী সাহেব এই জেলে রইলাম, কিন্তু শহর কোন দিকে, বাজার কোথায়, চোখেও দেখতে পেলাম না। দুইদিন পর আবার মুলতান থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে সিন্ধুনদের তীরে নিয়ে আমাদেরকে একটি গান বোটে চড়িয়ে দিল এবং তাতে সারিবদ্ধভাবে বসাল। এর পর পূর্বের বেড়ী হাতকড়ি ও ডান্ডার সঙ্গে নতুন করে লোহার আর একটি শিকল বেড়ীর মাঝখানে পরিয়ে দেয়া হল। এর ফলে কেউই নিজ নিজ

জায়গা থেকে নড়াচড়া করতে সমর্থ ছিল না। এ সময়ে আমাদের প্রত্যেকের শরীরে প্রায় আধ মণ করে লোহা ছিল। সেজন্য যতদিন জাহাজের আরোহী ছিলাম, ততদিন নিজ নিজ জায়গায় বসেই প্রস্রাব পায়খানার কাজ সম্পাদন করতাম। সিন্ধু নদের বুকভরা পানি আমাদের পদতলে থাকলেও পানির অভাবে তৈয়ম্মম দিয়েই নামায পড়তাম।

www.boighar.com

করাচী উপস্থিতি

এইতো অবস্থা, তবু আমরা আনন্দিত। কারণ জেলখানার বাইরে আসতে পেরেছি। তাছাড়া রয়েছে বন্ধুদের পরস্পর সাহচর্য, স্রোতস্বিনীর উদ্দামগতি আর পার্শ্ববর্তী আরণ্য দৃশ্য। এই অবস্থায় চলতে চলতে পাঁচ ছয়দিন পর আমরা কোটলিতে পৌঁছলাম। পথে সিন্ধুনদের তীরে শুক্কর বাখরা ও থাট্রা নামক বিখ্যাত দুর্গ এবং কোটলির সম্মুখে সিন্ধুর অপর পারের বিখ্যাত হায়দারাবাদ শহরটি আমাদের দৃষ্টি গোচর হল। কোটলী থেকে রেল যোগে সেদিন আমরা করাচী যাই। এখানে বড় বড় টুপি ও টুকরির মতো বিরাট বিরাট পাগরী পরা সিন্ধিদের দেখলাম। টুপিওয়ালারা সম্ভবত মুনশী ও কেরানী এবং পাগরীওয়ালারা হিন্দু মহাজন। হিন্দুস্তানী ভাষা ও উর্দু আর ফার্সীর দৌরাত্ম্য মুলতানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। সিন্ধু প্রদেশে সিন্ধি ভাষারই প্রচলন দেখা গেল। সিন্ধি ভাষা ফার্সী অক্ষরেই লিখিত কিন্তু তার বোলচালে একটি শব্দও আমাদের বোধগম্য হয়নি।

আলহামদুলিল্লাহ! করাচীর জেলখানায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হাতকড়ি ও পদযুগলে শোভিত লৌহদণ্ড থেকে রেহাই পাওয়া গেল। লোহার বেড়ীটুকুন রইল শুধু। মূলত অন্যান্য জেলখানার তুলনায় করাচীর জেলখানাকে অতিথিশালা বলা চলে। এখানে রাত্রিবেলা কয়েদীদেরকে জানোয়ারের মত ব্যারাকে বা খোঁয়াড়ে আবদ্ধ করে রাখা হয় না। তাদের জন্য বাংলো ধরনের উন্মুক্ত বাড়ি আর তাতে চাটাই শয্যা পাতা আছে। রাত্রে কয়েদীরা স্বাধীনভাবে জেলখানার সর্বত্র বিচরণ ও যেখানে ইচ্ছা শয়ন করতে পারে। কোন বাধা নিষেধ নেই। শান্ত্রীরা শুধু জেলের প্রাচীরের ওপরেই পাহারা দিয়ে থাকে। রাত্রে জেলখানার ভেতরে কোন প্রহরীর চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। দীর্ঘ দুই বৎসর পর আকাশ ও তারার শোভা দর্শন করবার সৌভাগ্য এই প্রথম হলো।

করাচীতে হপ্তাখানেক থাকার পর আমাদের একটি পালের জাহাজে নিয়ে উঠান হল। এই সর্বপ্রথম করাচীতে সমুদ্র ও সামুদ্রিক জাহাজ দেখলাম। এই জাহাজকে বলে বগোলা; ছোট জাহাজ। কয়েদীদেরকে বস্তা বোঝাই করার মতো

জাহাজের নীচে তলায় ঠাসাঠাসি করে ভরে দিল। নঙ্গর উঠিয়ে বন্দর ত্যাগ করলে কিছুদূর এগুতে না এগুতেই জাহাজ দুলতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে আরোহীদেরও বমন শুরু হয়ে গেল।

বোম্বাই

যাই হোক, অতিকষ্টে দুই তিন দিন পর আমরা বোম্বাই বন্দরে প্রবেশ করলাম। সেখানে দেখি মাইলের পর মাইল জুড়ে হাজার হাজার জাহাজ। একে জাহাজের অরণ্য বলা চলে। বোম্বাই দুর্গের পাদদেশে ডিঙ্গির সাহায্যে আমাদেরকে নামান হল এবং সেখান থেকে রেলযোগে থানা জেলখানায় নিয়ে গেল। তা বোম্বাই বন্দর থেকে দশ-বারো মাইল দূরে অবস্থিত। বোম্বাই শহরে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে পার্শীদেরকে ভ্রমণ করতে দেখলাম। এরা গৌরবর্ণ, খুব সুন্দর আর প্রচুর অর্থশালী। এরা অগ্নি উপাসক জরদশতী ধর্মালম্বী। দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমরের ইরান অধিকার করবার সময়ে এরা ইরান থেকে পালিয়ে ভারতের এই প্রান্তে এসে বসতি স্থাপন করে। বোম্বাই শহরের ইমারতগুলো আমার যদ্দুর দেখবার সুযোগ হয়েছিল খুব উঁচু এবং তাদের দেয়াল অসংখ্য জানালাযুক্ত। এই শহর একটি দ্বীপবিশেষ। একটি বাঁধের দ্বারা একে ভারতের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। বোম্বাই ও থানার মধ্যস্থলেও সমুদ্র প্রবাহিত। এর পানি ক্ষেতে আটকে দেওয়া হয়। আর রোদের উত্তাপে তা আপনা আপনি শুকিয়ে হয় সুন্দর লবণ। রেল লাইনের ধারে হাজার হাজার মণ লবণ স্তূপাকার হয়ে রয়েছে। নারকেল গাছ আর তাজা ডাব এই প্রথম আমি বোম্বাইতে দেখলাম। এখানকার মেয়েরা পুরুষদের মতো কাছা এঁটে ধুতির আকারে তাদের শাড়ী পরে এবং তাদের হাঁটুর উপর পর্যন্ত ও তার চারদিক খোলা থাকে। হিন্দুরা বিরাট লম্বা লম্বা পাগরী মাথার ওপরে টুকরির মতো স্থাপন করে রাখে। এ অঞ্চলের ভাষা গুজরাটী বা মারাঠী। রেলগাড়ী থেকে নেমে পদব্রজে থানার বাজারের ভেতর দিয়ে জেলখানার দিকে যাওয়ার সময় আমাদের সঙ্গী কয়েদীরা কয়েকটি মিষ্টির দোকান লুট করল এবং অবলীলাক্রমে লুণ্ঠিত মিষ্টান্ন খেতে লাগলো। এদেরকে কয়েদী জেনে বেচারা দোকানদারেরা কিছু বলল না; বরং কয়েকজন দোকানদার তাদের মিষ্টি কয়েদীদের মুখে পুরতে দেখে যেন খুশীই হয়েছে। চলতে চলতে সন্ধ্যার একটু আগে আমরা জেলখানার সামনে পৌঁছে গেলাম।

এই জেলখানাটি মারাঠীদের সময়কার একটি সুদৃঢ় দুর্গ। এর চতুর্দিকে গভীর পাকা খাল-পরিখার মতো। জেলে প্রবেশ করা মাত্রই আমাদের দেহ তল্লাশী শুরু হল। আমাদের প্রত্যেকের জুতো খুলে ফেরত দেয়া হয়নি। কথিত আছে,

একজন দগ্ধহৃদয় কয়েদী এই জেলের এক দারোগাকে একবার জুতা পেটা করেছিল। তার পর থেকে এখানে এই নিয়ম চালু করা হয়েছে।

রাত্রে দুইখানা করে জোয়ারের রুটি ও কিছু অল্প ডাল দিয়ে আমাদেরকে পৃথক পৃথক কামরায় বন্ধ করে দিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন থেকে আমাদের পাঞ্জাবী কয়েদীদেরকে গমখোর দেশের লোক মনে করে জোয়ারের বদলে গমের রুটি সরবরাহ করতে তাকে এবং এইভাবে আমাদের পর পাঞ্জাব থেকে আগত সমস্ত কয়েদীর আহার্যের জন্যে চিরদিনের তরে গমের রুটি নির্দিষ্ট হয়ে গেল।

ভোর বেলা আমাদের গোটা চালানকেই পাথর ভাঙ্গার কাজে লাগায়। অতিকষ্টে দুই একদিন তা সামাধা করলাম। আমাদের পৌঁছবার দুই দিন পর ওখানে সতরঞ্জি তৈরীর কাজ শুরু হল। আমাদের সঙ্গের পাঞ্জাবী কয়েদীরাই হলো তার পরিচালক। তারা মওলানা ইয়াহহিয়া আলী সাহেব ও আমাকে সতরঞ্জির কাজের উস্তাদ পরিচয় দিয়ে তাদের সঙ্গে নিল। এখানে একটি মাস বেশ আরামেই কাটে।

এই জেল ও এই প্রদেশে মারাঠী ভাষা প্রচলিত। সিন্ধুর মতো বোম্বাইতেও ফার্সী ও উর্দু অচল। করাচী ও বোম্বাইয়ের এই ভাষাগত সমস্যা দেখে আমার এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, আমার বাকী জীবনটা বোধ হয় মূর্খের মতো কাটবে। লেখনি ধারণ করার সুযোগ হয়তো আর কোনদিনই ফিরে আসবে না। লেখাপড়ার সাহায্যে মর্যাদালাভ করবার যে আশাটুকু ছিল, তাও তিরোহিত হয়ে গেল। ভরসা থাকল শুধু আল্লাহর অনুগ্রহ।

এই জেলখানার প্রধান জেলার একজন অত্যন্ত অহংকারী ব্রাহ্মণ। কিন্তু ইবরাহিম নামে আর একজন সহকারী আমাদের প্রতি বেশ সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। মাসখানেক থাকবার পর এখান থেকেও আমাদের বিদায়ের পালা এলো। সহকারী জেলার আমাদের রওনা দেওয়ার প্রাক্কালে ভারী বেড়ীগুলো খুলে ফেলে নামমাত্র হালকা বেড়ী পরিয়ে দিলেন।

ভারতের সর্বত্র জেলখানাসমূহে দেশী লোকদের, বিশেষত ভদ্রলোকের বড় দুরবস্থা। তাদের জন্য না খোরাক পোষাকের সুবন্দোবস্ত আছে, না পায়খানা প্রস্রাবের। শীত গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই তাদেরকে রাত্রে ব্যারাকে ব্যারাকে পশুর মতো আবদ্ধ করে রাখা হয়। দুষ্ট লোকদের অবশ্য আরাম আছে। দেশী কয়েদীদের কোন শ্রেণী মর্যাদা দেওয়া হয় না। কালো আদমী মাত্রই এক পর্যায়ভুক্ত। রাজা নবাব, মেথর-চামার সকলকে এক লাঠিতেই ঠ্যাঙান হয়। কিন্তু কোর্টপ্যান্ট পরা থাকলেই তার মর্যাদা আলাদা। ইউরোপীয় ও এ্যাংলো উভয়েই ইংরেজ সাহেবদের কাছে উচ্চ মর্যাদা পেতে থাকে।

আন্দামান যাত্রা

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে আমরা যমুনা নামক জাহাজে বোম্বাই থেকে আন্দামান যাত্রা করলাম। এটা বিলিতী জাহাজ। তার নাবিক ও অফিসার সবই ইংরেজ। হিন্দুস্থানী ভাষা কেউ বোঝে না। মতিলাল নামে একজন ইংরেজি শিক্ষিত কয়েদী আমাদের সঙ্গে ছিল। তার মারফত আমরা নাবিকদের সাথে কিছু আলাপ আলোচনা করতাম। তখন পর্যন্ত আমি ইংরেজির কিছুই শিখিনি। জাহাজে মুসলমানদের জন্য ডালভাত আর শুটকী মাছ, আর হিন্দুদের জন্য মিষ্টি তাজা চালের ব্যবস্থা ছিল। রুটি খেয়ে আমাদের সঙ্গী পাঞ্জাবীদের পক্ষে একমাস কাল একটানা দুই বেলা খাওয়া বড় কষ্টকর ছিল।

সমুদ্রে ঝড়

জাহাজ সমুদ্রে পৌঁছলে তুফান ও তরঙ্গে ভয়ানক দুলতে থাকে। অধিকাংশ আরোহীই বমি করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়লো। সাত বছর মেয়াদের একজন কয়েদী, যার মাত্র পাঁচ বছর বাকী ছিল, বমন হয়ে জাহাজের উপরই মারা গেল। আমরা শরিয়ত মোতাবেক তাকে গোছল করিয়ে কাফন পরিয়ে জানাজা পড়লাম। তারপর অনেকগুলো পাথরের সঙ্গে বেঁধে তার লাশটিকে সমুদ্রে ছেড়ে দিই। আমাদের প্রহরারত মেরাইন পল্টনের সেপাই দল আমাদের যথেষ্ট মেহেরবানী করতো। জাহাজ যখন সিংহলের ধার দিয়ে চলছিল, তখন ভীষণ ঝড় উঠলো। হাজার হাজার মণ ভারী জাহাজটা ফুটবলের মতো পানির ওপর নাচতে লাগল। একেক সময় সমুদ্রের পানি পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে একদিক থেকে আসত, আবার কখনো জাহাজ কয়েক হাত পানির নীচে চলে যেতো।

চৌত্রিশ দিন সমুদ্রের ওপর অবস্থান করার পর ১১ই জানুয়ারী বেলা বারোটার আগে আমাদের জাহাজ আন্দামানের পোর্টব্লেয়ারে পৌঁছে গেল। আম্বালা ত্যাগ করবার ঠিক এগার মাস পর আন্দামানে প্রবেশ করলাম। সমুদ্রেতীরে বসানো কালো পাথরগুলোকে দূর থেকে মনে হলো যেন দলে দলে মহিষ সাঁতার কাটছে। জাহাজ নঙ্গর করবার কিছু পরেই পোর্ট ব্লেয়ার বন্দরের ইনচার্জ একখানি নৌকায় চড়ে আমাদের কাছে এলেন। তার নৌকার মাঝি একজন হিন্দুস্থানী। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কেরানী মুহুরীর দরকার আছে কিনা এবং অফিস আদালতের কাজ কোন ভাষায় চলে? আমার কথায় সে আমাকে মুনশী ঠাউড়ে কিছু বাড়াবাড়ি করেই বলল যে, ওখানকার হাকিম, আর মালিকরা

তো সব মুনশীই এবং তারাই সর্বেসর্বা। সুতরাং করাচী, থানায় ও বোম্বাই অবস্থানকালে যে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়েছিল, এই শুভসংবাদে তা কিছুটা লাঘব হয়ে গেল। সামনে বড় বড় বোট আর নৌকা। তারা এসে আমাদেরকে রুশদ্বীপ নামক পোর্ট ব্লেয়ারের সদর টাউনে নিয়ে যেতে থাকে। আর তীরের কাছাকাছি যেতে দেখি বহু সংখ্যক মুনশী মৌলবী পরিষ্কার ও মূল্যবান জামা কাপড় পরে আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা এখনও নৌকা থেকে নামিনি। পাড় থেকে এক ব্যক্তি চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মুহম্মদ জাফর আর মওলানা ইয়াহহিয়া আলী সাহেব কি এই জাহাজে এসেছেন?

জবাবে আমি বললাম– হ্যাঁ, তাঁরা দুইজনই এসেছেন।

আমার এই জবাব শুনে তাঁরা পানির মধ্যে ঝাঁপিয়ে এবং হাতে হাতে করে আমাদেরকে নৌকা থেকে নীচে নামিয়ে নিয়ে গেলেন। নিচে নেমেই জানতে পারলাম, মওলানা আহমদুল্লাহ যিনি আমার এক বৎসর পর পাটনায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ১৫ই জুন ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মানে আমার ছয় মাস আগেই আন্দামানে পৌঁছে গেছেন। অন্য একটি জাহাজের কয়েদীদের নিকট, যারা বোম্বাই থানা জেল থেকে আমাদের আগেই রওনা হয়ে মাত্র দুইদিন পূর্বে পৌঁছেছিল, আমাদের আগমনবার্তা জানতে পেরে মওলানা সাহেব আমাদের প্রতিক্ষায় ছিলেন এবং অন্যান্য লোকেরাও তারই ইঙ্গিতে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ঘাটে এসেছিল।

চলাফেরা করার অবাধ অধিকার

জাহাজ থেকে অবতরণ করার পর অভ্যর্থনাকারী দলের সঙ্গে মুসাফাহ ও মুয়ানেফা করলাম এবং আমাদের সহযাত্রী কয়েদীদের সঙ্গ ত্যাগ করে মুনশী গোলাম নবী সাহেবের বাড়িতে হাজির হলাম। তিনি মেরিন ডিপার্টমেন্টের মুহরী ছিলেন। সেখানে মওলানা আহমদুল্লাহ সাহেব ও অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটল। সেই বাড়িতেই আমরা তিনজন অবস্থান করতে থাকি। আমাদের পায়ের বেড়ী কেটে দেওয়া হলে আগে থেকে তৈরী করে রাখা ভাল পোষাকও পেলাম। সমবেত বন্ধুগণের সঙ্গে দস্তরখানায় বসে একত্রে আহার করলাম। তারপর থেকে আমাদের মুক্তিলাভের দিন পর্যন্ত আমাদেরকে আর কখনো কয়েদীর ব্যারাকে বাস করতে, তাদের পোষাক পরতে কিংবা আহার্য গ্রহণ করতে হয়নি। এদিন থেকেই যেন আমাদের সত্যিকার মুক্তি হয়ে গেল। যদিও দীর্ঘ আঠার বৎসর কাল চাকুরেদের মতো নির্বাসন ভোগ করেছিলাম। তবু সেদিন বিকাল থেকে বাড়ি বাড়ি দাওয়াত হতে লাগলো।

এরূপ উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় খাদ্য পরিবেশন হতে থাকে যে, এমন উচ্চাঙ্গের আহার্য ভারতেও কোনদিন আমাদের ভাগ্যে জুটেনি। সারাজীবন আমাকে জেলের খানা খেয়েই কাটাতে হবে, আমার এই বদ্ধমূল ধারণাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা তাঁর উত্তম প্রতিদানে চির অবসান ঘটিয়ে দিলেন এবং তাঁর অনন্ত মহিমার প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখালেন।

এই দ্বীপে পৌঁছে দেখতে পেলাম স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সহস্র সহস্র কয়েদীর ললাটে তাদের নাম, অপরাধ ও যাবজ্জীবন দণ্ড কথাগুলো উল্কি দ্বারা এঁকে দেওয়া হয়েছে। তকদিরের লেখার মতোই এই লেখাগুলো সারাজীবন অক্ষয় হয়ে থাকে, নিশ্চিহ্ন হয় না। কিন্তু সেই অদৃশ্য শক্তির অনুগ্রহে আমাদের আন্দামান পৌঁছাবার পূর্বেই মাথায় উল্কি আঁকবার আদেশ গোটা ইংরেজ রাজত্ব থেকে চিরদিনের জন্য রহিত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং আমাদেরকে সেই কলংকময় চিহ্ন বহন করতে হল না।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ বঙ্গোপসাগরের ৯২ ডিগ্রী ৪৩ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশে ও ১১ ডিগ্রী ৪৩ মিনিট উত্তর অংশে অবস্থিত। প্রায় এক হাজার দ্বীপের সমষ্টি এই দ্বীপপুঞ্জ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ নামে অভিহিত। এর আয়তন ১৭৪৬ বর্গফুট। কলকাতা থেকে এর দূরত্ব ছয়শো মাইলের মতো। ভূতত্ত্ববিদদের ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় এই দ্বীপপুঞ্জ অতীতে এশিয়া মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল। নৈসর্গিক উত্থান-পতন ও সমুদ্র তরঙ্গঘাতে ইহা স্থল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং পরিণামে একটি অপরটি থেকে আলাদা হতে হতে শত শত সমুদ্রদ্বীপে রূপান্তরিত হয়। এখান থেকে মৌলমিন তিনশো মাইল পূর্ব উত্তরে, সিঙ্গাপুর চারশো মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, নোপাং সাড়ে তিনশো মাইল পূর্বদিকে, নেকোবর আশি মাইল দক্ষিণে, মাদ্রাজ আটশো মাইল পশ্চিম দিকে এবং সিংহল আটশো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এখানকার দ্বীপগুলো সেই পর্বতময়। সমভূমি খুবই কম। মাউন্ট হেরিয়েট সর্বোচ্চ পাহাড়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা এগারশো ষোল ফুট। সুপেয় পানির কোন স্রোতস্বিনী এখানে নেই। বর্ষাকালে স্থানে স্থানে উঁচু টিলা থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়, কিন্তু অন্য সময়ে তা শুকিয়ে যায়। কূপ ও দীঘির সংখ্যা প্রচুর। এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে পোর্ট ব্লেয়ারের উত্তর দিকে একটি গন্ধকের পাহাড় আছে। তা থেকে সর্বদাই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়। এখানকার জঙ্গলে শূকর ছাড়া আর কোন চতুষ্পদ হিংস্র পশু বা পক্ষী নাই।

www.boighar.com

নানা সম্পদ

লোয়াবে আবাবিল এখনকার এক উৎকৃষ্ট বস্তু। ইন্দ্রিয়-শক্তি বৃদ্ধিকল্পে এ ছাকানকুর, অর্থাৎ গো-সাপের মাংসের অপেক্ষাও নাকি অধিকতর মূল্যবান। বাজারে এর দাম টাকায় টাকায় তোলা। এখানকার জঙ্গলে হাজারো রকমের উৎকৃষ্ট ও মজবুত কাঠ পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশের কাঠের থেকে এর জাত সম্পূর্ণ আলাদা। এখানকার ঝাউ গাছগুলোও বিভিন্ন প্রকারের হয়। প্রবাল, বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক পাখী, নানা প্রকার শামুক, শঙ্খ ও বিচিত্র বর্ণের কড়ি ও ঝিনুক অন্যতম রপ্তানী দব্য। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ফলমূল আম, জাম তেঁতুল কাঁঠাল, বড়াল, জায়ফল, নারকেল, পান-সুপারী স্বভাববই এখানে আছে। এখন জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় পঞ্চাশ ষাটটি গ্রামও গড়ে উঠেছে। সব রকমের তরি-তরকারী ও খাদ্যশস্য যেমন ধান, ভুট্টা, অড়হর, মুগ, মাসকলাই, আখ এখানে প্রচুর জন্মে। কিন্তু গম ও ছোলা ধরনের রবিশস্য ও শীতপ্রধান দেশের শাকসবজি মোটেই হয় না। গভর্নমেন্ট গম ছোলা কলকাতা থেকে আমদানী করে। সেগুলোর দর প্রতি পাউন্ড সাত পাই। বারো মাসই মেলে এবং একই দর। কাজেই এসব জিনিসের জন্য কোন অসুবিধে হয় না।

বর্তমানে এখানকার আবহাওয়া এত চমৎকার যে, পৃথিবীতে আর কোথাও এমন স্বাস্থ্যকর স্থান আছে কিনা সন্দেহ। কলেরা, বসন্ত, জ্বর– এমনি সব ব্যাধির অস্তিত্ব নেই। আমার বিশ বৎসরের জীবনে কোনদিনই এইরূপ কোন রোগের খবর পাইনি।

বিষুব রেখার কাছাকাছি হওয়ায় এখানে বারো মাসই দিনরাত্রি প্রায় সমান থাকে, তারতম্য অতি সামান্য। শীতও নেই, গ্রীষ্মও নেই। বারো মাস আমাদের দেশের চৈত্র-বৈশাখ মাসের আবহাওয়া বিরাজ করে। ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে একটা চাদর গায়ে দেওয়ার দরকার হয়। শীতের দিনেও কেউ কম্বল তৈরী করে না। এখানে হেমন্ত ঋতু নেই, নেই বসন্ত। কিন্তু বারো মাসই বৃক্ষলতা ফুলে ফলে সুসুভিত থাকে। এখানকার আদিম অধিবাসী আজন্ম উলঙ্গ জংলী জাতিগুলোকে বাঁচাবার জন্যই যেন বিধাতা ঋতুর এই অপূর্ব ব্যবস্থা করেছিলেন।

বৃষ্টিপাত খুব বেশি। মে থেকে নভেম্বর গর্যন্ত সাত মাস দিনরাত অবিরাম বৃষ্টি হতে থাকে। এজন্যই বাড়িঘরের ছাদগুলো ঢালু করে তৈরী। আমাদের দেশের কাঁচা ও চ্যাপ্টা ছাদ ঐ বৃষ্টিতে একদিনও টিকতে পারতো না। শীতকালে কখনও বরফ পড়ে না, ঝড়ও হয় না কখনো।

জঙ্গল অত্যন্ত ঘন ও দুর্গম, গাছগুলো গগনস্পর্শী উচ্চ। কোন গাছ কেটে ফেললে তার ডালপালা বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

আদিম অধিবাসী

এখানকার অরণ্যে স্মরণাতীতকাল থেকে একটি আজন্ম উলঙ্গ জংলী জাতি বাস করে আসছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দিগম্বর। কাপড় চোপড় কেনার সংগতিও তাদের নেই। এই জংলীদের তথা কখন কোথা থেকে তারা এসেছে, ইতিবৃত্তান্ত কিছুই এ পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে তারা নরমাংস ভোজী নয়, এ কথা ঠিক।

পোর্ট ব্লেয়ারের নামকরণ

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে সর্বপ্রথম লেফটেন্যান্ট ব্লোয়ার নামে এক জাহাজী অফিসার এখানে এসে নোঙর স্থাপন করেছিলেন। তাঁরই নামে এই দ্বীপের নাম পোর্ট ব্লেয়ার। এসময়, অর্থাৎ একশত বৎসর পূর্বে গভর্ণমেন্ট আরো একবার দ্বীপান্তরের কয়েদীদের জন্য এই দ্বীপপুঞ্জকে নির্দিষ্ট করেছিলেন। কিন্তু তখনকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না। তাই ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে বসতি স্থাপনের পরও তার উচ্ছেদ সাধন করেন। পুনরায় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৮৫৭ সালের মার্চ মাস থেকে যখন আবার বসতি স্থাপন শুরু হয়, তখন ওখানকার আদিবাসীরা সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। এই অসন্তোষ ক্রমে সশস্ত্র বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়। প্রথম সুপারিন্টেডেন্ট ডাঃ ওয়াফার সাহেবের শাসনকালে জংলীরা বিরাট বাহিনী সমাবেশ করে একবার হেদুর ওপর এবং দ্বিতীয়বার আব্‌রতিনের ওপর আক্রমণ চালায়। সদয় ব্যবহার আর কুটনীতি দ্বারা ওদেরকে ক্রমে সরকারের বশীভূত করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় বহু হত্যাকাণ্ড করলেও, এখন জঙ্গল কি লোকালয় যেখানেই দেখা হোক, তারা ভদ্র আচরণেই অভ্যস্ত। এদের দৈর্ঘ সাধারণত চার ফুট থেকে পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি পর্যন্ত। হাবশীদের মতো রং কালো, মাথা গোলাকার, চোখ বড় বড়, মাথায় ভেড়ার লোমের মতো কোঁকড়ান চুল। এরা খুব শক্তিশালী ও পরিশ্রমী।

আকিদা ও কালচার

সমগ্র আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এরা বারোটি জাতি বাস করে। এক জাতির ভাষা অন্য জাতির সঙ্গে বিশেষ খাপ খায় না। ওরা বিশ্বাস করে স্রষ্টা আকাশে আছেন। তিনি সকল বস্তুরই কর্তা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কাহারো দ্বারা সৃষ্ট নন। তিনি অনাদি ও অনন্ত। তাঁর বাসস্থান যে আসমান, তা খুবই সুন্দর। তাঁকে কেউ

দেখতে পায় না। তাঁরই আবাস থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। তাঁরই নিকট থেকে বজ্রের গর্জন ও বিদ্যুতের শিখা পৃথিবীতে আসে। তাঁরই হুকুমে মৃত্যু হয়। তিনি রুজী ও কল্যাণদাতা। তাঁর একজন স্ত্রী আছে। তাঁর নাম 'চানাপালক'। ইনিও স্বয়ম্ভু। কিন্তু তাঁর মর্যাদা বিধাতা অপেক্ষা হীন। ইতি সমুদ্রের মৎস পয়দা করেন এবং আকাশ থেকে সেগুলো ফেলে দেন।

এরা শয়তানকেও স্বীকার করে এবং মনে করে যে সমস্ত মন্দ কাজ শয়তানই করায়। কিন্তু তাদের মতে শয়তান দুই জন। একজন স্থলভাগের যার নাম 'আরাম চৌগলা'। কেউ যদি অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ওরা মনে করে আরাম চৌগলা তাকে মেরে ফেলেছে। অপরজন পানির শয়তান। নাম 'জরুডাণ্ডা'। কেউ পানিতে ডুবে মরলে তারা বলে জরুডাণ্ডা তাকে হত্যা করেছে। এরা দেবদূতেও বিশ্বাসী। তারা মনে করে দেব দূতেরা নারী পুরুষ উভয় জাতি বিশিষ্ট। তারা জঙ্গলে বাস করে ও মানুষের দেখাশুনা করে। ভূত-প্রেতের প্রতিও তাদের বিশ্বাস আছে। কিন্তু বলে যে, তাদের কোন ক্ষমতা নেই। এরা খুদা বা অন্য কাউকে পূজা করে না। নূহ (আ.) এর তুফানের প্রতি এরা আস্থাশীল। বলে যে, জমিনের উপর এমন একটি প্লাবন এসেছিল যে, তাতে সমগ্র পৃথিবী ডুবে গিয়েছিল। তখন জংলীদের বুজুর্গ ব্যক্তিরা একখানি নৌকা তৈরী করে, তাতে আরোহণ করেছিলেন এবং তুফান প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘকাল তাতে আত্মরক্ষা করেছিলেন। তুফান নেমে গেলে আন্দামানের কোন পাহাড়ে নৌকা পাড়ি জমিয়েছিল।

বিবাহ

এই আদিবাসীরা দুই-এর বেশি সংখ্যা গুনতে জানে না। আশৈশব ন্যাংটা চলাফেরা করে। মেয়েরা কেবল তাদের গুপ্তস্থানে ছোট একটি পাতা উল্টে রেখে দেয়। পুরুষেরা কেউ গোঁফ দাড়ি কি চুল কিছুই রাখে না। কাঁচের টুকরা দিয়ে কামিয়ে ফেলে। এদের বিয়ে শাদির ব্যাপারটাও খুব সাদাসিধে। বিয়ের সময় বর-কনে উভয়কেই লাল রঙে রঞ্জিত করা হয়। গোত্রের সকল লোক আসে এই সমাবেশে। একজন বরকে উঠিয়ে নিয়ে কনের সামনে বসায়। বরের সামনে অনেকগুলো তীর ধনুক রেখে দেয় আর তখন তাকে বলা হয়, সে এইগুলোর সাহায্যে শিকার করে স্ত্রীর প্রতিপালন করবে। তখন কাজী উচ্চৈঃস্বরে 'আবার এক' এই শব্দটি উচ্চারণ করে। এর অর্থ– নিয়ে যাও, এ তোমার স্ত্রী। এর পরই বিবাহ পাকা হয়ে গেল। তারপর সারাজীবন তাদের মধ্যে না আছে তালাক, না আছে ছাড়াছাড়ি। বিয়ের পর এদের মধ্যে ব্যভিচার হয় না।

সন্তান প্রসবকালে এদের পর্দা করবার কোন প্রয়োজন হয় না। সন্তান জন্মলাভ করবার পর একজন স্ত্রী লোক পাতা দিয়ে মাছি তাড়িয়ে থাকে– আর একজন নাড়ি কেটে শিশুকে কোলে নিয়ে বসে। প্রথমদিন অন্য কোন স্ত্রীলোক স্তন্যদান করে। দ্বিতীয় দিন থেকে শিশুর মা নিজেই স্তন্যপান করায়। প্রসবের পর পরই প্রসূতি চলাফেরা করতে থাকে। বেছে চলবারও প্রবণতা নেই। শিশু একটু বড় হলেই তীর ধনুক হয় তার প্রথম খেলার সামগ্রী।

বাসগৃহগুলো খুব ছোট ও নড়বড়ে। চারটি খাম মাত্র খাড়া করে তার উপর পাতার ছাউনি দিয়ে কিছুদিনের জন্যে একটি আশ্রয় তৈরী করে নেয়। ঘরে স্বামী স্ত্রী ছাড়া আর কোন মালপত্র বা সম্পত্তি বলে কিছু নেই। তীর ধনুকই ওদের আসল সম্পত্তি এবং ওটাই ওদের প্রাণ। ছোট ছোট ডিঙ্গি তৈরী করে, এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে চলাফেরা করার এই তাদের অবলম্বন।

আন্দানের আবহাওয়ার উন্নতি

১৮৫৮ থেকে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দ্বীপপুঞ্জের আবহাওয়া অত্যন্ত মারাত্মক ছিল। এখানে বসতি স্থাপনের প্রাথমিক অবস্থায় একটি জাহাজী ব্যাধি মহামারিরূপে দেখা দেয়। ফলে হাজার হাজার লোক মানবলীলা সংবরণ করে। কিন্তু শুকুর আল্লাহর, আন্দামানে আমি পৌঁছবার এক বৎসর পূর্বেই ওখানকার সমস্ত ব্যাধি দূর হয়ে গিয়েছিল এবং আবহাওয়া তা কাশ্মীরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিল। একে অস্বাস্থ্যকর স্থান উপরন্তু নতুন বসতি স্থাপন, সেইজন্য ইংরেজরা কয়েদীদের জন্যে এখানকার আইন-কানুন খুব মোলায়েম করে রেখেছিল। তাদের সঙ্গে সর্বোতভাবে সহৃদয় ব্যবহার করা হত। কিন্তু আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠলে ও বস্তির সংখ্যা বেড়ে গেলে তারা এমন সব কঠোর বিধিবিধান প্রবর্তন করলো, যেগুলো হিন্দুস্থানের জেলখানার চেয়েও মারাত্মক।

আইনের নমুনা

আমাদের আন্দামান পৌঁছবার পর থেকেই এখানকার বিধানসমূহ কঠোর হতে লাগলো। অবস্থা এরূপ দাঁড়ালো যে, নতুন কয়েদীকে এখানে এসে দশ বৎসর কাল কঠোর মেহনত করতে হবে, সে ভাণ্ডার থেকে পাবে খাদ্যখানা এবং মোটা কাপড়, ব্যারাক জীবনই তার ভাগ্য। তাছাড়া কোন রকম সহানুভূতিও তাকে দেখান হবে না। উদাহরণস্বরূপ– ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আন্দামানে প্রচারিত আইনের

একটি বাক্য উদ্ধৃত করছি– 'দ্বীপান্তর শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদীগণকে কঠিন পরিশ্রমে লিপ্ত করা ও যাহাতে খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে শুধু সেই পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করা উচিত হইবে।' তবে এই আইন-কানুন কেবল নবাগত কয়েদীদের প্রতিই প্রযুক্ত হচ্ছিল এবং আমরা পুরাতন লোকেরা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলাম।

আমি এখানে পৌঁছে দেখতে পেলাম ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত অসংখ্য রাজা, নবাব, জমিদার মওলানা, মুফতী, কাযী, ডেপুটি কালেকটার, মুনসেফ, সদরই আমীন, রিসালদার সুবাদর, জমাদার কয়েদী আছে। এঁরা শুধু কালা আদমী ও জন্মগত হিন্দুস্থানী হওয়ার অপরাধে মুচি-মেথরদের মতো মোটা ভাত-কাপড় পেতেন এবং সাধারণ কয়েদীর ন্যায় তাদেরকে কায়িক পরিশ্রমে লিপ্ত হতে হতো। অথচ শ্বেতকায় ইউরোপীয়, এমনকি বাদামী এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরাও কোট প্যান্ট ও ইংরেজি ভাষার বদৌলতে গোরা সৈন্যদের মতোই খোরাক পোষাক পেত। অধিকন্তু তাদের বাসের জন্য একটি বাড়ি ও খেদমতের জন্য বিনাবেতনে একজন ভৃত্যও দেওয়া হতো। আর যে গোরা ইংরেজ বা এ্যাংলোর লাইসেন্স থাকতো, পঞ্চাশ টাকা করে মাসোহারাও পেত তারা।

আমাদের আন্দামান পৌঁছবার সপ্তাহ খানেক পরেই সিঙ্গাপুরের পূর্বদিকে অবস্থিত সারাওয়াক দ্বীপের শাসক ব্রুক্স এর চাহিদামতো ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহীদের পঞ্চাশজনকে সেখানে পাঠান হয়। সুতরাং এদের স্থানান্তরের ফলে কতগুলো উৎকৃষ্ট পদ খালি হয়ে গেল। সংবাদপত্র ও মওলানা আহমদুল্লাহ সাহেবের মারফতে আন্দামান কর্তৃপক্ষ আমার যোগ্যতা ও জ্ঞানগরিমা সম্পর্কে সবিশেষ অবগত ছিলেন। এভাবে এখানে পদার্পণ করবার কিছুদিনের মধ্যেই আমাকে সুপারিন্টেডেন্ট ও চীফ কমিশনারের কোর্টে সেকশন ক্লার্ক বা নায়েবে মীর মুনশী রূপে নিয়োগ করা হলো। বাসগৃহ ও চাকরও পেলাম। স্বাধীন নাগরিকের মতো যদেচ্ছা চলাফেরা করবার অধিকার ফিরে এলো। কোন বাধা নিষেধই রইল না। এ সময় আমার বয়স মাত্র সাতাশ বৎসর। পূর্ণ যৌবনকাল। এ বয়সে একক জীবন যাপন করা দ্বীন বা দুনিয়া কোন দিক দিয়েই নিরাপদ ছিল না। এমতাবস্থায় প্রথমত আমি আমার স্ত্রীকেই দেশ থেকে আনবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাতে আইনগত বাধা ছিল। সুতরাং আমার পৌঁছবার কয়েক মাস পর সদ্য কাশ্মীর থেকে আগতা একটি অল্পবয়স্কা মেয়েকে বিয়ে করলাম। আকস্মিক বিপাকে পড়ে সে আন্দামানে এসেছিল।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে ডিসেম্বর মওলানা আবদুর রহীম সাহেব আন্দামানে পদার্পণ করেন। আমি তখন পরসুইরা প্রিন্ট নামক দ্বীপে থাকি। আন্দামানে

পৌঁছে তিনি প্রথমত ঘাট মুনশী নিযুক্ত হলেন এবং তার অল্পকাল পর হাসপাতালের কেরানীর পদ পেলেন। এইভাবে প্রায় নয় বৎসর কাল সরকারী পদে বহাল থাকার পর তিনি বস্ত্র ব্যবসায়ের দোকান খোলবার টিকিট গ্রহণ করেন এবং এই দোকানদারী পেশার মারফতেই তাঁর মুক্তি লাভ হয়।

লর্ড মেয়োর হত্যাকাণ্ড ও অতঃপর

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস। কর্নেল মেইন অবসর গ্রহণ করে বিলাত চলে গেলেন। অক্টোবর মাসে জেনারেল ষ্টুয়ার্ট, যিনি শেষ পর্যন্ত ভারতের কমান্ডার-ইন-চীফ পদে উন্নীত হয়েছিলেন, চীফ কমিশনাররূপে আন্দামান এলেন। তাঁরই শাসনকালে লর্ড মেয়োর সাহেবের নির্দেশক্রমে পোর্ট ব্লেয়ারের বন্দীদের জন্য ভাণ্ডার থেকে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা হয়। লর্ড মেয়ো রচিত আইন কানুনগুলোও জারি হয়ে গেল। যার ফলে আন্দামানের বন্দীদের দুর্দশা হিন্দুস্থান ও বিলেতের জেলখানাসমূহের কয়েদীদের চেয়েও গুরুতর আকার ধারণ করলো। ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেয়ো বাহাদুরের হত্যাকাণ্ডও এই স্টুয়ার্ট সাহেবের কার্যকালেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই ঘটনা সংক্ষেপে পাঠকদের কাছে পেশ করছি।

লর্ড মেয়ো ছুরিকাহত

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সকাল সাতটার সময় চারখানা গানবোট যোগে লর্ড মেয়ো বাহাদুর আন্দামানে পদার্পণ করলেন। বহু সংখ্যক সাহেব ও মেম দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণ মানসে লর্ড সাহেবের সঙ্গে এসেছিলেন। সকাল ৮টার সময় তিনি পোর্ট ব্লেয়ারের হেডকোয়ার্টার রুশদ্বীপে কয়েকজন সঙ্গীসহ জাহাজ থেকে নামলেন। অবতরণকালে একুশবার তোপধ্বনি করে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হলো। আযাদ ও কয়েদী হাযার হাযার নরনারী এই দৃশ্য দেখবার জন্যে তখন রুশদ্বীপের ঘাটে উপস্থিত ছিল। ঘাটে নেমেই তিনি দ্বীপের বাজারের দিকে অগ্রসর হলেন। তারপর ইস্কুল হাসপাতাল কয়েদী ও পল্টন ব্যারাকসমূহ পরিদর্শন করলেন এবং শেষে আন্দামান চীফ কমিশনারের বাংলোতে উপনীত হন। সেখানে নাশ্‌তাপর্ব সেরে বিশ্রাম গ্রহণ করেন ও পরে গোরা সৈন্যদের ব্যারাক পরিদর্শন শেষে দ্বীপর দ্বীপে গেলেন। এই দ্বীপরের জেলখানাতেই সমস্ত দুষ্ট কয়েদীর স্থান। দ্বীপর সফর করবার পর তিনি চাটুমে ফিরে আসেন। সেখান থেকে মাউন্ট হেরিয়েন্ট দ্বীপে চলে যান কিন্তু তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী ও চীফ

কমিশনার উভয়েই সন্ধ্যাকালে ওখানে যাওয়া থেকে তাঁকে নিরস্ত করতে অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু লর্ড বাহাদুর সে সব বিশেষ আমল দিলেন না। চাটুম থেকে গাড়ীতে উঠে মাউন্ট হেরিয়েন্টের পাদদেশে অবস্থিত হুটিয়ুনে পৌঁছলেন। সেখান থেকে সওয়ারী যোগে ইয়াবু পর্বতে আরোহণ করলেন। তখন সূর্য অস্তমিত প্রায়। লর্ড বাহাদুর পাহাড়ের ওপরে বসে প্রাণভরে সমুদ্রে সূর্যাস্তের দৃশ্য উপভোগ করলেন। বললেন 'এমন দৃশ্য জীবনে আর কোনদিন দেখেননি।' অন্ধকার হয়ে গেল। সেই অন্ধকারে মশাল জ্বলে উঠলো। তিনি সেই আলোকে নীচে অবতরণ করলেন। তখন একটি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী তাঁর চতুর্দিকে প্রহরারত ছিল। প্রাইভেট সেক্রেটারী ও চীফ কমিশনার সাহেব তাঁর ডান ও বাঁয়ে দেহের সঙ্গে দেহ মিলিয়ে চলছিলেন। তাছাড়া পেছনে বহু সংখ্যক অফিসার। সমুদ্রতীরে একখানা গাড়ী সেদিন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। সেখানে পৌঁছতেই চীফ কমিশনার সাহেব বিশেষ কোন প্রয়োজনে লর্ড বাহাদুরের অনুমতিক্রমে কিছুক্ষণের জন্য পেছনে গেলেন। লর্ড বাহাদুর তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীসহ ধীরে ধীরে পদব্রজে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে ঐ গাড়ীর নীচে লুক্কায়িত এক ব্যক্তি ছুরি হাতে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ল এবং লর্ড সাহেবকে এমনভাবে দুইটি আঘাত হানলো যে, তিনি কম্পিত শরীরে সমুদ্রে গড়ে গেলেন। ঐ হট্টগোলে মশালের আলোগুলোও নির্বাপিত। একজন কয়েদী অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে আততায়ীকে ধরে ফেলল। নইলে সে হয়তো আরো দুই চারজনকে হত্যা করতো। লর্ড সাহেবকে সমুদ্র থেকে তুলে নিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষমান গাড়ীতে তাঁকে শায়িত করা হল। সেখানেই তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় দুই একটি কথা বলতে বলতে মানবলীলা সংবরণ করলেন।

হত্যাকারীর পরিচয় ও তার বিবৃতি

অতঃপর হত্যাকারীর সঙ্গে নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরগুলো অনুষ্ঠিত হল–

প্রশ্ন : কেন তুমি এই কাজ করলে?

উত্তর   আল্লাহর হুকুমেই আমি তা করেছি।

প্রশ্ন : এই কার্যে তোমার কোন সঙ্গী আছে?

উত্তর : হ্যাঁ, আল্লাহ আমার সঙ্গী।

তারপর তার প্রতি প্রযোজ্য আইনের বিধানাবলী পরীক্ষা করবার পর বেঙ্গল হাইকোর্টের অনুমোদনক্রমে হত্যাকারীকে ফাঁসি দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তার নাম শের আলী। সে জেলা পেশোয়ারের একজন পাহাড়ী আফগান। সে নিম্নরূপ

বিবৃতি দিয়েছিল—

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ থেকেই আমার সংকল্প ছিল যে, আমি কোন একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীকে হত্যা করব। সেই কয়েক বৎসর যাবত আমি এই ছোরাখানা তৈরি করে রেখেছিলাম। বিগত ৮ই ফেব্রুয়ারী যখন লর্ড বাহাদুর আগমন করলেন এবং তাঁর সালামীর তোপধ্বনি হলো তখন আর একবার আমি ছোরাখানা ধার দিয়ে নিলাম। সারাদিন ঐ রুশদ্বীপে যাওয়ার চেষ্টায় ছিলাম। সেখানে লর্ড বাহাদুরের চলবার পথে আমার সাক্ষাত ঘটতে পারত। কিন্তু সেখানে যাওয়ার অনুমতি পাইনি। সন্ধ্যা পর্যন্ত যখন আমি নিরাশ হয়ে পড়লাম, তকদীর তাঁকে আমার বাড়িতেই নিয়ে এলো। আমি তাঁর সঙ্গে পাহাড়ের উপরেও গিয়েছিলাম এবং তাঁর সঙ্গেই ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু যাওয়া কি ফেরার পথে কিংবা পাহাড়ের ওপরে কোথাও এরূপ সুযোগ পাইনি। তখন এই গাড়ীর আড়ালে এসে লুকিয়ে রইলাম এবং এখানেই আমার মনের সাধ পূর্ণ হল।

লোকটি ক্ষীণকায়, খাটো এবং দেখতে কুৎসিত। কিন্তু ভয়ংকর শক্তিশালী ও সাহসী ছিল। ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করে সে কয়েদীদেরকে সম্বোধন করে উচ্চৈঃস্বরে বলল, ‘ভাই সকল! আমি তোমাদের শত্রুকে শেষ করেছি, তোমরা সাক্ষী থেকো যে, আমি মুসলমান।’

তারপর সে কলেমা পড়তে লাগলো এবং ঐ কলেমা তেলাওয়াতের সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রাণ পাখী উড়ে গেল।

এর মাত্র একমাস পুর্বে চীফ জাষ্টিস মিঃ নরম্যানকেও কলকাতায় এমনিভাবে একজন পেশোয়ারী পাঠান হত্যা করেছিল। এই সকল নৃশংস ও শিক্ষামূলক ঘটনাবলী অনুষ্ঠিত হবার পর স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজদের পক্ষে পাঠানদের শত্রুতায় উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইংরেজরা পাঠানদেরকে পূর্বাপেক্ষা বেশি খাতির করতে লাগল। অপর পক্ষে ওহাবীদের প্রতি তাদের শত্রুতা বেড়ে গেল।

ঈশ্বরী প্রসাদের চেষ্টা

লর্ড মেয়োর এই হত্যাকাণ্ডের পর, কলকাতার পুলিশ কমিশনার লিমিট সাহেব আমাদের পুরাতন বন্ধু লালা ঈশ্বরী প্রসাদ এবং আরো একজন নামকরা পুলিশ অফিসার ওহাবীদেরকে এই মোকদ্দমায় জড়িত করবার সংকল্প নিয়ে পাড়ি দিয়ে পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছলেন। এই ঈশ্বরী প্রসাদ ইতিপূর্বে আমাদের সঙ্গে প্রণয়

দেখিয়ে সার্জনের পদ থেকে ডেপুটি কালেকটরের পদে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু খোদাওয়ান্দ করীমের কৃপায় তখন কয়েকজন ভাল অফিসার পোর্ট ব্লেয়ারে ছিলেন। তাঁরা আমাদের কার্যকলাপ, চালচলন, এই হত্যাকাণ্ড ও হত্যাকারী সম্পর্কে সবিশেষ অবগত ছিলেন এবং সেজন্যই এবারকার মতো ঈশ্বরী প্রসাদের শিকার সন্ধান ব্যর্থ হয়ে গেল। নইলে সে পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছেই অতীতের মতো মিথ্যা সাক্ষ্য প্রস্তুত করবার কাজে লেগে গিয়েছিল। কিন্তু জেনারেল ষ্টুয়ার্ট বলে দিলেন, 'ওহাবীদের সম্পর্কে আমি সবিশেষ ওয়াকিবহাল আছি। সুতরাং আমি আমার এলাকায় অকারণ এইরূপ অন্যায় কার্য অনুষ্ঠিত হতে দেব না।'

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ওহাবী গ্রেফতারীর যে আগুন থানেশ্বরে জ্বলে উঠেছিল, তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। একে নেভাবার চেষ্টা না করে স্বয়ং আমাদের মুসলিম এবং হিন্দু ভ্রাতৃবৃন্দ তাতে তৈল ও তারপিন রূপ ইন্ধন যোগাতে লাগলো। তদুপরি হান্টার সাহেবের গবেষণা। তিনি ভারত সরকারকে এমন আতংকিত করে তুললেন যে, সরকার পাটনা সাদেকপুরের ঘরবাড়ি, যেগুলোতে মুজাহিদ বাহিনীর লোকেরা আশ্রয় গ্রহণ করতেন এবং তথাকার কল্পিত বিদ্রোহীদের সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দিতে লাগলেন। এতেও দীল ঠাণ্ডা হল না। ১৮৭২ সালের শেষভাগ পর্যন্ত পাটনা-বাংলার নিরপরাধ মুসলমানদের গ্রেফতার কার্য অব্যাহত রাখা হল।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে মওলানা তাবারক আলী ও মওলানা আমিরুদ্দীন আমাদের কাছে আন্দামানে পৌছেন। কিন্তু নবপ্রবর্তিত আইনসমূহের কড়াকড়ির দরুন দীর্ঘকাল তাঁদেরকে শ্রমস্বীকার করতে হয়। যাই হোক, কিছুকাল পর প্রথমজন ষ্টেশন ক্লার্ক ও দ্বিতীয়জন মাদ্রাসার ছাত্রদের উস্তাদ নিযুক্ত হন এবং মাত্র দশ বৎসর সাজা খাটবার পর ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড রিপনের কৃপায় তারা আমাদের সঙ্গে আপন গৃহে ফিরে আসেন।

ওহাবীদের ওপর গভর্নমেন্টের এই ক্রোধ ও উপর্যুপরি তাদেরকে দশ বৎসরকাল ধরে সাগর পার করার মূল উদ্দেশ্য ছিল– ভারতের বুক থেকে তাদের সমূলে উচ্ছেদ, যাতে করে তাদের বীজ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যায়। আমি কিন্তু কালাপানি থেকে ফিরে এসে বিপরীত ফলই দেখতে পেলাম। আমার এদেশে অবস্থানকালে গোটা পাঞ্জাবে মোট দশজন ওহাবী মতাবলম্বী মুসলমান ছিলেন কি না সন্দেহ। অথচ এখন দেখতে পাচ্ছি, এমন কোন গ্রাম বা শহর নেই যার এক চতুর্থাংশ মুসলিম অধিবাসী মওলানা ইসমাইল সাহেবের অনুসারী নন। দিন দিন এই দলটি এমন বিরাটহারে বাড়ছে যে, একদিন যেমন প্রোটেস্ট্যান্টরা গোটা ইউরোপের ভেতর অকস্মাৎ বিস্তার লাভ করেছিল, এরাও যেন ঠিক তেমনি।

আসলে অত্যাচার দিয়ে আদর্শের গতিরোধ করা যায় না। বরং তাতে সে আরো শক্তিশালী হয়।

ইতিমধ্যে আমি ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলাম। তাই ডঃ হান্টারের লিখিত 'আওয়ার ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থখানা পাঠ করবার প্রবল আগ্রহ জন্মাল। অনেক চেষ্টার পর কলকাতা থেকে সাত টাকা মূল্যের এর দ্বিতীয় মুদ্রণের একখানা বই আনলাম। বইখানা পাঠ করে দেখলাম, ডক্টর-প্রবর এক স্থানে বিরাট ভূমিকা দিয়ে লিখেছেন– 'গভর্নমেন্ট যদি নরপতি সুলভ অনুকম্পাবশে ওহাবীদেরকে কালাপানি থেকে মুক্তি দেন, তাহলে তারা উহাকে আল্লাহর দান মনে করে হিন্দুস্থান প্রত্যাবর্তনের পর ইংরেজ রাজত্বের আরো অধিকতর ধ্বংস ও বরবাদীর কারণ হবে।'

www.boighar.com

গোড়া থেকে আমরা গভর্নমেন্টের যেরূপ ক্রোধভাজন ছিলাম, তাতে মুক্তি সম্পর্কে একরূপ হাত ধুয়েই বসেছিলাম। যা একটু হীন আশা ছিল, তাও এই মন্তব্য পাঠে তিরোহিত হতে লাগলো। এরপর গভর্নমেন্ট যখন যাবজ্জীবন দণ্ডপাপ্ত কয়েদীদের বিশ বৎসর সাজা খাটবার পর মুক্তি দেয়ার আইন প্রবর্তন করলেন, আমরা তারও বাইরে পড়লাম। তার ওপর গ্রন্থকর্তা স্বয়ং হান্টার সাহেব গভর্নর জেনারেলের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হলেন, তখন আমরা সর্বাধিক নৈরাশ্য অনুভব করলাম। ভাবলাম, যার বই একবার পড়লে বিচক্ষণ ইংরেজও আমাদের চিরশত্রু হয়ে পড়ে, গভর্নর জেনারেলের দরবারে তাঁর এই নৈকট্য লাভের পর আমাদের মুক্তির প্রশ্নতো দূরের কথা, না জানি আরও কত কি বিপদ তিনি টেনে আনবেন।

ডক্টর হান্টারের গ্রন্থ থেকে আরও একটি তথ্য অবগত হলাম– তিনি তার বইয়ের ২৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'অধুনা আমি যখন সিমলায় বসে এই গ্রন্থ রচনা করেছি তখন মুহম্মদ শফী সরকারী সাক্ষীরূপে পাটনায় তার জ্ঞাতিভ্রাতাদেরকে গ্রেফতার করিয়ে দিচ্ছে। এই সেই শফী ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আম্বালা কোর্টে যার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। যদি ফাঁসিকাষ্ঠেই ঝুলান হত, তাহলে আজ সহস্র সহস্র মুসলিম নরনারী তাকে শহীদ মনে করে তার কবর জেয়ারত করত। আজ সেই শহীদ ব্যক্তি সরকারী সাক্ষী সেজে তারই ধর্মালম্বী ও সহমতালম্বী ভ্রাতৃবৃন্দকে প্রাণপণে ফাঁসাবার চেষ্টা করছে।'

হান্টার সাহেবের এই মন্তব্য শুধু শফী নয়, সমস্ত মুসলমানের প্রতি কটাক্ষপাত, যদিও শফী ছাড়া সমাজগতভাবে আর কোন মুসলমানের প্রতি তা প্রযোজ্য নয়। কারণ মুসলমানদের দলে আমিও ছিলাম, আমাকে কেন সাক্ষী করা হয়নি? ক্যাপ্টেন পার্সন ১৮৬৩ সালে আমাকে সাক্ষী বানাবার কোন চেষ্টারই ত্রুটি

করেনি। কিন্তু সে চেষ্টাকে আমি শিশুসুলভ খেলাই মনে করেছিলাম। আমি ডক্টর হান্টারের সঙ্গে এ সম্পর্কে একমত যে, 'মুসলমান দীনদার ও নির্ভীক পুরুষদের পক্ষে তা শোভনীয় নয়, যা মুহম্মদ শফী দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।' যেসব গরীব মুসলমান মুহম্মদ শফীর সাক্ষ্যে গ্রেফতার হয়েছেন তাঁদের আত্মীয়-স্বজন তার সম্বন্ধে কি অভিমত পোষণ করছেন? মুহম্মদ শফী তার এই কাপুরুষোচিত কার্যকলাপের দ্বারা সরকারী কয়েদ থেকে অবশ্য কয়দিনের জন্যে রক্ষা পেয়েছিল, কিন্তু মৃত্যুর কবল থেকে তো রেহাই পায়নি? অবশেষে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমি যে সাক্ষী সাজিনি, আজও বেশ আরামে সশরীরে বেঁচে আছি। এখনো আমার অনেক শত্রু আছে, কিন্তু কেউই আমার একটি লোম পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারে না।

১৮৭৬ সালের জুন মাস। আমি পোর্ট ব্লেয়ারের দক্ষিণ জেলায় মীর মুনশী নিযুক্ত হয়ে আবরডীনে বদলী হয়ে গেলাম। আমি যার অফিসের চাকুরে– ডেপুটি কমিশনার প্রার্থু সাহেব ছিলেন আমার পুরাতন বন্ধু ও শাগরিদ। ইনি আমার সহযোগিতায় পোর্ট ব্লেয়ারের একটি আইন গ্রন্থ রচনা করেন এবং তা গভর্নমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে সাধারণ্যে প্রকাশ লাভ করে। আমি স্বয়ং তার উর্দু অনুবাদ করেছিলাম আর সেটাও মুদ্রিত হয়েছিল। আমার চৌদ্দ বৎসরের প্রশংসনীয় কার্যকলাপ প্রার্থু সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁরই প্রস্তাবক্রমে আমার মুক্তির সুপারিশ করে ভারত গভর্নমেন্টের নিকট রিপোর্ট প্রদত্ত হয়েছিল। অবশ্য তার ফল হয়েছিল যা হবার তাই। হোম ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী এমন চটে গিয়েছিলেন যে, ফলে আমার মুক্তি তো দূরের কথা বরং আমার মৃত্যু অথবা বৃটিশ রাজত্বের অবসান না ঘটা পর্যন্ত আমার মুক্তিলাভের আশা আকাশ কুসুমে পরিণত হয়ে গেল।

মওলানা আবদুর রহীমের স্ত্রীর আবেদন পত্র

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মওলানা আবদুর রহীম সাহেবের পুত্র মওলানা আবদুল ফাত্তাহ সাহেব পিতার সাক্ষাৎ লাভের জন্য পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছলেন এবং প্রায় এক বৎসর কাল এখানে থেকে ভারতে ফিরে গেলেন। মওলানা সাহেব খাস তাঁর মুক্তিলাভের জন্য একখানা দরখাস্তের মুসাবিদা নিজ পুত্রের মারফত ভারতে পাঠিয়ে দিলেন। এই মুসাবিদা মোতাবেক একখানা দরখাস্ত তাঁর স্ত্রীর পক্ষ থেকে ভারতের গভর্ণর জেনারেলের নিকট ১৮৮২ সালের এপ্রিল মাসে প্রেরিত হল। তাতে লেখা ছিল, আমার স্বামীর বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে কোন গুরুতর অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। তথায় সেশন জজ ও চীফ কোর্ট উভয় স্থান

থেকেই এই নির্দেশ দেওয়া ছিল যে, সাধুজীবন যাপন সাপেক্ষে চৌদ্দ বৎসর পর আবদুর রহীমের মোকদ্দমা পুনর্বিবেচনা করা যাবে। কিন্তু এখন আঠার বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল। তাঁর অভাবে আমি অত্যন্ত কষ্টভোগ করছি এবং তিনিও অত্যধিক বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। সুতরাং আমার বিনীত প্রার্থনা, সরকার বাহাদুর তাঁর মোকদ্দমাটিকে পুনর্বিবেচনা মারফত তাকে মুক্তিদান করুন।

এই দরখাস্ত পাঠ করে গভর্ণর জেনারেল লর্ড রিপন ফাইল তলব করা ছাড়াও এ বিষয়ে পাঞ্জাব ও বাংলা সরকারের অভিমত চেয়ে পাঠালেন– এইসব ওহাবীকে খালাস করে দিলে কোন ক্ষতির কারণ আছে কিনা। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অভিমত আসবার পর এই মোকদ্দমার ব্যাপারটি পরবর্তী বৎসরের প্রথমভাগ পর্যন্ত মুলতবী রাখা হল। এই দরখাস্ত কেবল মওলানা আবদুর রহীম সম্পর্কেই ছিল এবং সত্যিই তার কোন অপরাধ ছিল না। শুধু বিদ্রোহীদের বংশধর জ্ঞান করে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সুতরাং আমরা শুধু তাঁরই মুক্তির প্রতীক্ষায় ছিলাম এবং এই উপলক্ষে আমার নিজের মুক্তিলাভের কোন কল্পনা আমার ছিল না। আমাদের আন্দামান অবস্থানের শেষ দিকে বেঙ্গল কোরের সমস্ত সাহেব পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছেছিলেন। সুতরাং তাদের বিদ্বেষ অধিকতর আমাদের দিকেই ছিল। ১৮৮১ সালে মওলানা আহমদুল্লাহ সাহেবের বয়স যখন প্রায় আশি বৎসর, বার্ধক্য ও দুর্বলতার জন্য তিনি অত্যন্ত রুগ্ন ও শত্রুদেরও অনুকম্পার পাত্র হয়ে পড়ে ছিলেন; নিজের এই মুমূর্ষু অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে কলকাতায় অবস্থিত তাঁর পুত্র মওলানা মুহম্মদ ইয়াকিন সাহেবকে ডেকে এনে তাঁর সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। এই সাক্ষাৎকার পোর্ট ব্লেয়ারের আইন বিরোধীও ছিল না। নিছক ওহাবী হওয়ার কারণে তার এই দরখাস্ত না-মঞ্জুর হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে আমিও দরখাস্ত পাঠিয়ে আবেদন জানালাম যে, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ রশীদকে পোর্ট ব্লেয়ারে আমার নিকটে আসবার অনুমতি দেওয়া হোক। এই দরখাস্তের সেই একই দশা। এ সময়ে আমার বেতন বৃদ্ধির আবেদন জানিয়ে আর একখানা দরখাস্ত দাখিল করলাম। তাতে জেলা কর্তৃপক্ষেরও দীর্ঘ সুপারিশ লিখিত ছিল। কিন্তু চীফ কমিশনার কর্নেল কিডল যে আদেশ জারি করলেন তার প্রতি ছত্রেই যেন শত্রুতা ও বিদ্বেষের বিষোদগারে পূর্ণ। তখন আমার ধারণা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আমি কর্তৃপক্ষের চক্ষুশূল। সর্বদাই তারা এই চেষ্টায় আছে যে, আইনগত কোন ফাঁক পেলেই বেত্রাঘাত ও দ্বীপরজেল সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির দ্বারা মনের জ্বালা মেটাতে পারেন। কিন্তু খোদাওয়ান্দ করীম হেন কর্মকর্তা থাকতে আমার পরোয়া কিসের?

অসুস্থতাবশত মওলানা আহমদুল্লাহ সাহেব যখন শয্যাগত ও ক্ষীণ প্রদীপের মতো দুর্বল হয়ে পড়লেন তখন মওলানা আবদুর রহীম সাহেব তাঁর মুমূর্ষু অবস্থার কথা বর্ণনা করে কর্তৃপক্ষকে লিখে জানালেন, দ্বীপরে তাঁকে (আহমদুল্লাহ সাহেবকে) দেখাশোনা করবার কেউ নেই এবং তিনি (আবদুর রহীম) তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। সুতরাং মওলানা সাহেবকে আবরডিনে তাঁর গৃহে স্থানান্তরিত করবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

এই দরখাস্ত এমন যা পাঠ করলে পাষাণও বিগলিত হয়। অথচ তা নামঞ্জুর হয়ে গেল এই জন্য যে, আবদুর রহীম ও আহমদুল্লাহ উভয়েই ওহাবী। ওহাবীদের প্রতি কোনরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করা যেতে পারে না। মওলানা সাহেবের অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়লো। এদিকে সাহেবদের মতিগতিও নৈরাশ্যজনক। তখন মওলানা আবদুর রহীম সাহেব আর একবার আবেদন জানালেন যেন তাঁকে রাত্রিকালে দ্বীপরে রোগীর শয্যাপার্শ্বে অবস্থান করবার এযাযত দেওয়া হয়। বহু আলোচনা ও সমালোচনার পর এই দরখাস্তখানা গৃহীত হয় এবং সেই মতে মওলানা আবদুর রহীম সাহেব ২০শে নভেম্বর সন্ধ্যাবেলা রোগীর শয্যাপাশে উপনীত হন।

সেই রাত্রেই ২১শে নভেম্বর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ২৮শে মহররম ১২৯৮ হিজরীর সোমবার রাত ১টার সময় তার প্রাণপাখী জান্নাতুল ফিরদৌসে উড়ে গেল। মওলানা সাহেবের মৃত্যুকালে আবদুল ওয়াহিদ নামক তার একজন কর্মচারী হাসপাতালে তাঁর শিয়রে উপস্থিত ছিল। তার বর্ণনায় জানা গিয়েছিল, মওলানা সাহেব, যিনি কয়েকদিন যাবত অজ্ঞান ছিলেন, মৃত্যুর মুহূর্তে চোখ খুলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইয়া মালিকুল মুলক' পড়তে পড়তে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন।

২১শে তারিখে আটটার সময় আবরডিনে আমরা এই সংবাদ পেলাম। বন্ধু-বান্ধবসহ আমরা বহুলোক সকাল ৯টার সময় দ্বীপরে পৌঁছি। আমি আবরডিনে জেলা কাচারীর মুনশী ছিলাম। সুতরাং জেলা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ঐ দ্বীপ ত্যাগ করাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু সাহেবেরা আমার উপর যেরূপ বিদ্বেষপরায়ণ তাতে অনুমতি পাওয়ার কোন আশা ছিল না। এ হেন অবস্থায় আমি আল্লাহর ভরসায় বিনা অনুমতিতেই ওখানে চলে গেলাম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একখানা দরখাস্ত লিখে জানিয়ে দিলোম যে, মওলানা আহমদুল্লাহ সাহেব ইন্তেকাল করেছেন। আমি তাঁর দাফন কাফনে শরিক হওয়ার জন্য দ্বীপরে রওনা হলাম। অদ্যকার এই অনুপস্থিতির জন্য যেন আমাকে মার্জনা করা হয়। দ্বীপরে পৌঁছে আমরা শেষবারের মতো ইংরেজ প্রভুদের

খেদমতে আর একখানা আবেদন জানালাম যে, মওলানা সাহেবের মৃত দেহটিকে আবরডিনে তার সহোদর মওলানা ইয়াহহিয়া আলী সাহেবের কবরের পার্শ্বে সমাহিত করবার অনুমতি দেওয়া হোক। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয়, এ দরখাস্ত খানাও মঞ্জুরী পেল না। সুতরাং গোসল ও জানাজার পর তাকে দ্বীপরের কাছাকাছি ডান্ডাসপেন্টের গোরস্থানে দাফন করা হল।

১৮৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমার প্রথমা স্ত্রী পানিপথ থেকে লিখে পাঠালো যে, মেয়ের বয়স হয়েছে, তার বিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন। আমার মুক্তি পাওয়ার বাহ্য লক্ষণ না দেখে সেখানেই যাতে বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারে তার অনুমতি চাইল। শুভকার্যের খরচাদি উপলক্ষে কিছু টাকা পাঠাতেও লিখলো। আমি তিনশো টাকা, কিছু গহনাপত্র ও কাপড়চোপড় পানিপথে পাঠালাম। লিখলাম তুমি কোন দীনদার পরহেজগার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিয়ে দিও।

আমার জিনিসপত্র পৌঁছলে আমি বিবাহে যোগদান করতে না পারায় ওখানে ক্রন্দনের রোল পড়ে গেল। আমার স্ত্রী ও কন্যা অশ্রু বিগলিতকণ্ঠে প্রার্থনা করছিল, হে কাদের, হে করীম, তাঁকেও এই বিবাহ উৎসবে যোগদান করবার তৌফিক দাও।

খোদাওয়ান্দ করীম সেই মুহূর্তেই যেন তাদের ফরিয়াদ কবুল করে নিলেন। এই সালেরই ৩০শে ডিসেম্বর আমাকে মুক্ত করে দেওয়ার অর্ডার হয়। এই সংবাদ আমার কাছে পৌঁছার আগেই আমার স্ত্রী জানতে পারে। আমি তাকে লিখে দিলাম, আমি স্বয়ং আসছি, আমি এসেই সকল ব্যবস্থা করব।

মুক্তির তারিখ যতই নিকটবর্তী হতে লাগলো ততই আগন্তুক প্রত্যেক বোটেই আমার মুক্তির আদেশের অপেক্ষা করতে লাগলাম। এদেশের উপহারযোগ্য দ্রব্যসামগ্রী সমস্ত জমা করে নিয়ে বিদায়ের জন্য বসে রইলাম।

সকলের মুক্তির আদেশ

অবশেষে ১৮৮৩ সালের ২২শে জানুয়ারী সোমবারে মহারাণী নামক গান বোট এই সংবাদ নিয়ে পৌঁছল যে, ওহাবী বিদ্রোহ সংশ্লিষ্ট যত কয়েদী আছে সকলকেই মুক্তি দিয়ে হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। তাদের নিজ নিজ সরকার তাদের বসবাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দেবে। এ সময় আমি মওলানা আবদুর রহীম, মিঞা আবদুল গাফফার, মওলানা তাবারাক আলী, মওলানা আমীরুদ্দীন ও মিঞা মসউদ মোট এই ছয়জন ওহাবী মামলার আসামী ওখানে ছিলাম। আমাদের সকলেরই রেহাই হয়ে গেল।

আমার মুক্তির আদেশ তো পেলাম। এখন আমার স্ত্রীর কি হবে? বলা প্রয়োজন, পোর্ট ব্লেয়ারে আমার দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিতা একটি মেয়েকে বিবাহ করেছিলাম। তখন তার মাত্র চৌদ্দ বৎসর কয়েদী জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। সুতরাং সেই বোটেই হিন্দুস্থান গভর্নমেন্টকে জানান হল, যতদিন তার স্ত্রীকে মুক্তি প্রদান করা না হয়, ততদিন সে হিন্দুস্থানে রওনা হতে পারে না। আমার মুক্তির আদেশ পেয়ে আমিও তৎক্ষণাৎ পাঞ্জাব সরকারকে জানালাম, এখানে আমার একটি সুন্দর বাসাবাড়ি আছে, উপরন্তু মাসিক একশত টাকা বেতনে আমি চাকরি করছি। পান্তরে হিন্দুস্থানে আমার বাড়িঘর বলতে কিছুই নেই। তাছাড়া সম্ভবত পাঞ্জাবের অফিসারবৃন্দ অহেতুকভাবেই আমাকে পীড়ন করবেন। আমাকে একজন অতীত কয়েদী মনে করে হয়তো কোন চাকরীও না দিতে পারেন। তাই সমস্ত বিষয় চিন্তা করে আমি প্রার্থনা করছি যে, স্বাধীনভাবে আমাকে অত্র কালাপানিতে বাস করবার অনুমতি দেওয়া হোক, যাতে আমি সময় সময় হিন্দুস্থানে গিয়ে আমার সন্তান সন্ততিদের দেখে আসতে পারি।

পাঞ্জাব সরকার কিন্তু এই আবেদন মঞ্জুর করলেন না। পান্তরে পরিবারবর্গসহ আমাকে ভারতে প্রস্থান করবার নির্দেশ দিলেন। তবে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, ভারতে আমাকে চাকরী দিতে কোন আপত্তি হবে না। পাঞ্জাব সরকারের সেক্রেটারীর পক্ষ থেকে পোর্ট ব্লেয়ারের চীফ কমিশনারকে ১৮৮৩ সালের ২২শে মার্চ তারিখে লিখিত ১১৬ নং পত্র অনুসারে এই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।

সঙ্গীদের প্রস্থান

তেসরা মার্চ তারিখে মওলানা আবদুর রহিম, মিঞা আবদুল গাফফার, মওলানা আমিরুদ্দীন ও মওলানা তাবারাক আলী সাহেবান পোর্ট ব্লেয়ার থেকে যাত্রা করে সম্পূর্ণ নিরাপদে আপন আপন গৃহে ফিরলেন। এরপর আটাশে এপ্রিল মিঞা মসউদও রওনা হয়ে গেলেন। একাকী আমি শুধু স্ত্রীর মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়ে গেলাম। ১লা মে তার মুক্তির আদেশ এল, কিন্তু তখন সে ছয় মাসের গর্ভবতী। সমুদ্রেও ঝড় তুফানের মৌসুম তখন আরম্ভ হয়েছে। এই সমস্ত অনিবার্য কারণে নভেম্বর পর্যন্ত পোর্ট ব্লেয়ারে বাস করবার অনুমতি চেয়ে নিলাম। ইত্যবসরে আমার দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত আসবাবপত্র সমস্তই বিক্রয় শুরু করলাম। এবং যেন তেন প্রকারে তা সম্পন্নও হল। বাকী রইল শুধু কাঠের তৈরী আমার শয়ন গৃহ। এখানে কোন মসজিদ ছিল না। সে জন্য অসুবিধা হত। আমি আমার ঘরটাকে মসজিদে রূপান্তরিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। সকলেই তাতে খুব আনন্দিত

হলেন। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার মেজর বার্চ সাহেব বিদ্বেষসৃষ্ট মনোভাব নিয়ে রিপোর্ট দিলেন যে, এই লোক ওহাবী, এই মসজিদও ওহাবীদের দখলে থাকবে। অতএব এই কারণে এখানে মসজিদ স্থাপন করবার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। দুঃখের বিষয়, এই ওহাবী বিদ্বেষ এমন নিঃস্বার্থ সৎকাজেও অন্তরায় হয়ে পড়ল।

পোর্ট ব্লেয়ারের আইন-কানুন ও চালচলন

পোর্ট ব্লেয়ারে অবতরণ করবার পর সেখানকার আনুষঙ্গিক ভৌগোলিক ও আদিম বাসিন্দাদের অবস্থা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। এখন তার আইন-কানুন, পোষাক পরিচ্ছদ ও চালচলন সম্পর্কে কিছু বলে এই দ্বীপপুঞ্জ থেকে চির বিদায় গ্রহণ করছি–

শাসন

এই দ্বীপটি অন্যান্য অঞ্চলের মতো চীফ কমিশনার শাসিত একটি পৃথক দেশ। আন্দামানের চীফ কমিশনার বাহাদুর নিজ পদাধিকার বলে যে কোন এ্যাক্ট ইচ্ছা করেন এখানে জারি করতে পারেন। তিনি তাঁর অধীনস্ত অফিসারদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা যে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী ক্ষমতা দান করতে পারেন এবং তিনি এখানকার সেশন জজও বটেন। তাঁর আদেশ বা বিচারই ফাইনাল, তার কোন আপীল চলতে পারে না। শুধু ফাঁসির মোকদ্দমার বেলায় গভর্ণর জেনারেলের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। বাকী দেওয়ানী ও ফৌজদারী যাবতীয় কাজের বেলায় চীফ কমিশনারই সর্বেসর্বা। তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন জাহাজ, যাত্রী, মাল বা আসবাবপত্র কিছুই এখানে আসতে পারে না। তাঁর অমতে কোন ব্যক্তি এই স্থান ত্যাগ করতেও অসমর্থ।

চীফ কমিশনার এখানকার রাজধানী রুশদ্বীপে বাস করেন। তাঁর বেতন মাসিক তিন হাজার টাকা।

এই অঞ্চলটি দুই জেলায় বিভক্ত। দক্ষিণ জেলার প্রধান শহর আবরডিন এবং উত্তর জেলার প্রধান চাটুম। উত্তর জেলার কর্তৃপক্ষের অধীনে বেশ কয়েকজন এ্যাসিষ্ট্যান্ট ও একস্ট্রা এ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনার আছেন।

এই দ্বীপপুঞ্জের শাসনতন্ত্র ও নিয়মাবলী ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তিত হয়ে আসছে কিন্তু বরাবর কড়াকড়ি ও কঠোরতার

দিকেই এর গতি। যিনিই চীফ কমিশনার হয়ে নতুন আসেন তিনিই নতুন নতুন আইনের মারফত আরো কঠোরতা বৃদ্ধি করেন। এখানে বাৎসরিক প্রায় দুই হাজার কয়েদী ভারত থেকে প্রেরিত হয়। বর্তমানে প্রায় চৌদ্দ হাজার কয়েদী অবস্থান করছে। আগেই বলেছি, জাহাজ থেকে অবতরণ করবার এক মাস পর তাদের পায়ের বেড়ী কেটে দেওয়া হয়। তাদের জন্য এখানে কোন জেলখানা নেই। তারা অফিসার কয়েদীদের অধীনে ব্যারাকে বাস করে। দিনের বেলায় ভারতীয় জেলখানার কয়েদীদের মতো কায়িক পরিশ্রম করা বাধ্যতামূলক। দুইবেলা তারা তৈরী আহার পায়। ব্যারাকগুলো পাহারা দেবার জন্য কোন পুলিশ বা সৈন্য নেই। কয়েদী অফিসারেরাই সব রক্ষণাবেক্ষণ করে। মোট কথা, কয়েদীদের দেখাশোনা করা ও পাহারা দেওয়া, তাদের ভাগ করে কাজে লাগানো এবং তাদের দ্বারা কাজ আদায় করে নেয়ার সকল দায়িত্ব কয়েদী অফিসারদেরই। এরা মাথায় লাল পাগরী ও গলায় চাপরান পরে। খোরাক ছাড়াও এরা পদমর্যাদা অনুসারে গভর্নমেন্ট থেকে নগদ বেতন পেয়ে থাকে। নতুন কয়েদীরা সদ্ভাবে জীবন যাপন সাপেক্ষে তিন চার বৎসর কিছু কিছু বেতন পেতে আরম্ভ করে। বেতনভোগী হওয়ার পর এরাও পট্রাদার অফিসার নিযুক্ত হয়। দশ বৎসর কাল সৎভাবে জীবনযাপন করবার পর প্রত্যেক পুরুষ কয়েদী টিকিট পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। টিকিট পাওয়ার অর্থ এই যে, কয়েদী স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবার অধিকার পেল। এখন সে শহরে বা বস্তিতে যে কোন পেশার সাহায্যে ইচ্ছামতো জীবন যাপন করতে পারে। এরূপ প্রায় পঞ্চাশ ষাটটি কয়েদীদের বস্তি আছে। এসব বস্তিতে কয়েদীরাই নম্বরদার, চৌকিদার এবং পাটোয়ারী। যারা কৃষি কাজের টিকিট গ্রহণ করে সরকার থেকে তারা গ্রামের ভেতরে পনের বিঘা পরিমাণ জমি পায়। তিন বৎসর পর্যন্ত তাদের খাজনা মাফ। কখন কখন সরকার থেকে তাদেরকে গরু, খোরাক ও টাকা পয়সা সাহায্য দেওয়া হয়। রুটিওয়ালা, মিঠাইওয়ালা বা নাপিত এরাও নিজ নিজ পেশার জন্য মাঝে মাঝে সরকারী সাহায্য পেতে থাকে। তার মানে, টিকিট পাওয়ার পর কয়েদীরা আযাদী লাভ করে, সে ইচ্ছা মতো কাজ করতে পারে।

নারী কয়েদীরা নারী কয়েদী অফিসারদের অধীনে একটি পৃথক দ্বীপে ব্যারাকে বাস করে। ব্যারাকে বাসকালে যাতে তাদের নৈতিক চরিত্রের পতন না ঘটে, সেজন্য যথোপযুক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ব্যারাকে তারা যাঁতা পেশা, সেলাই এমনি ধরনের হালকা কাজে নিয়োজিত থাকে। এরা পাঁচ বৎসরেই আযাদীর টিকিট পেয়ে থাকে। কিন্তু টিকিট পেলেও, বিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত যুবতীদের ব্যারাকের বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। পাঁচ বৎসর মেয়াদ

ফুরোবার পর মেয়েরা ইচ্ছানুসারে যে কোন পুরুষের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু পুরুষদের বেলায় টিকিট ওয়ালা ছাড়া অন্য কারুর বিয়ে করা নিষিদ্ধ। বিবাহেচ্ছু ব্যক্তি স্ত্রীলোকদের দ্বীপে গিয়ে যাকে পছন্দ করে প্রয়োজন হলে টাকা পয়সা দিয়েও তার সম্মতি আদায় করে। দুইজনে রাজী হওয়ার পর উভয়ের স্বীকৃতি ও প্রণয়ের সঙ্গে জীবন নির্বাহ করবার একটি অঙ্গীকার পত্র চীফ কমিশনার সাহেবের সম্মুখে বসে লিখে দিতে হয়। তারপর স্ত্রী স্বামীর ঘরে চলে যায়। টিকিট প্রাপ্ত কয়েদীরা দেশ থেকে তাদের স্ত্রী-পুত্র কন্যাদেরকেও আনতে পারে। বিশ বৎসর কাল কোন কয়েদী সৎভাবে জীবন যাপন করলে সে মুক্তিও পেয়ে থাকে। মুক্তি লাভের পর ইচ্ছা করলে ঐ দেশেও থাকতে পারে, নয় স্বদেশে চলে যেতে পারে। টিকিট লাভের পর হালাল রোজগারের মারফত কয়েদী লক্ষ টাকা সঞ্চয় করলেও কারু কিছু বলবার নেই। কিন্তু টিকিট না পাওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতে বা বিনা অনুমতিতে নিজের কাছে বা পরের কাছে কোথাও টাকা পয়সা জমা রাখতে পারে না। শ্রমরত কয়েদী ব্যারাক ত্যাগ না করা পর্যন্ত প্রতি এক বৎসর তিন মাসে একখানা করে চিঠি দেশে পাঠাতে পারে। দেশ থেকে একখানা চিঠি পেতে পারে। পক্ষান্তরে টিকিটপ্রাপ্ত কয়েদী মাসে একটি পত্র পেতে পারে ও দিতে পারে।

বিচিত্র মানুষের মেলা

পোর্ট ব্লেয়ার এমনি স্থান যেখানে দুনিয়ার প্রায় সব জাতির এক অদ্ভুত সমাবেশ। এখানে চীনা, বর্মী, বাঙ্গালী, নিকোবরী, কাশ্মীরী, ইরানী, কামরানী, আরবি, ফার্সী, হাবশী, পর্তুগীজ, দিনেমার, এ্যামেরিকান, ইংরেজ, ফরাসী এবং ভারতের সমস্ত জেলা ও সমস্ত শহরের লোক, যথা– ভটিয়ৎ, নেপালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, উড়িয়া, গুজরাটী, পেশোয়ারী, আসামী, কর্নাটকী, বুন্দেলখণ্ডী, মাদ্রাজী, কোল, সাঁওতাল, তেলেঙ্গী, মৈথিলী, মারাঠা, বাঙ্গালী– সমস্ত মওজুদ। এরা পরস্পর এক সঙ্গে বসে কথা বলবার সময় মাতৃভাষাতেই কথা বলে। কিন্তু এখানেও কোর্ট ও বাজারের ভাষা হিন্দুস্থানী। সমস্ত দেশের লোক এখানে এসে আপনা আপনিই হিন্দুস্তানী ভাষা শিখে ফেলে। আমার মনে হয়, গোটা পৃথিবীর মধ্যে এক সঙ্গে এত বিভিন্ন জাতির বাস আর কোথাও নেই। যেন একটি অপূর্ব মেলা। এই ধরাপৃষ্ঠে এত বিভিন্ন জাতির সমবায়ে এহেন মেলা আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। বাঙ্গালী পুরুষ ও মাদ্রাজী স্ত্রীলোক, কিংবা ভূটানী পুরুষ ও পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক অথবা সিন্ধি পুরুষ ও কর্ণাটকী স্ত্রীলোক প্রভৃতি বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ, যারা একে অপরের ভাষা বুঝতে অসমর্থ। অথচ যখন স্বামী স্ত্রী

তর্ক লাগে বা তাদের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায় তখন একে অপরকে নিজ নিজ ভাষায় গাল দিতে থাকে, কিন্তু কেউ কারো গাল বুঝতে পারে না। তখন বাস্তবিকই এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এখানকার বিয়ে-শাদি উপলক্ষে দেশ দেশান্তরের মেয়েরা সমবেত হয়। তারা আপন আপন ভাষায় গান গায়, আপন আপন ভঙ্গিতে নৃত্য করে এবং আপন আপন দেশীয় পোষাক পরিধান করে। এই দৃশ্য পরম উপভোগ্য।

হিন্দুস্থানের বহু পুরাতন ব্যাধি জাতিভেদ প্রথার এখানে অস্তিত্ব নেই। কোন মুসলমান পুরুষ যে কোন শ্রেণীর মুসলমান স্ত্রীলোককে বিনা দ্বিধায় বিয়ে করে থাকে। অনুরূপভাবে হিন্দুদের জন্যও হিন্দু হওয়াই যথেষ্ট, একই শ্রেণীভুক্ত হওয়া অনাবশ্যক।

অভিজ্ঞতা থেকে আমার এই জ্ঞান লাভ হয়েছে যে, নিজ নিজ পোষাক-পরিচ্ছদ, সংস্কার, বোলচাল ও খানাপিনা প্রত্যেকের নিকটেই প্রিয়।

জংলীরা জঙ্গলে বাস, উলঙ্গ চলাফেরা ও কীটপতঙ্গ আহার্য নিয়েই সুখী। আমাদের খাদ্য দেখে তারা নাক সিটকায়, সে পোলাও-কোর্মাই হোক না। আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ পরিধানে তারা দারুণ অস্বস্তিবোধ করে। বর্মী ও চীনারা আমাদের ঘৃতজাত খাদ্যের গন্ধ পেলেই নাকে কাপড় দিয়ে সরে পড়ে। আমাদের পোলাও কালিয়া ও কোর্মার গন্ধে আরবিদের মস্তিষ্ক বিকৃতির উপক্রম হয়। ইংরেজরা আমাদের আতরের গন্ধ সইতে পারে না। মোট কথা, বাল্যকাল থেকে যে লোক যে জিনিসে অভ্যস্ত, তার কাছে তাই উত্তম।

আন্দামান থেকে বিদায়

নয়ই নভেম্বর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। সেদিন আমাদের বিদায়ের প্রাক্কালে বন্ধু-বান্ধবকে দাওয়াত করলাম। নিমন্ত্রণপত্রে লেখা ছিল 'আঠারো বৎসর এখানে অবস্থানের পর আজ আমি খাকসার চিরদিনের জন্য আপনাদের খেদমত থেকে বিদায় নিয়ে হিন্দুস্থান যাত্রা করছি। এই উপলক্ষে যে সামান্য আহার প্রস্তুত করা হয়েছে, আশা করি তাতে শামিল হয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করবেন।'

যাঁর কাছেই এই নিমন্ত্রণপত্র পৌছালো বিনা দ্বিধায় তিনিই ছুটে এলেন। রওনা হবার মাত্র এক ঘণ্টা পূর্বে দুপুর বেলা আমার বাড়িতে এই আহারের আয়োজন করা হয়েছিল। আমার বিদায়ে সমবেত বন্ধুদের চোখে অশ্রুর প্লাবন জাগলো। বিদায় সম্ভাষণ জানাতে উঠে যিনিই কিছুই বলতে চেষ্টা করলেন, দুই এক কথা বলতেই তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে এল। আমার নিজেরও কিছু বলার ছিল, কিন্তু

একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারলাম না। মনের কথা মনেই রয়ে গেল, কিছুই বলা হল না।

সেদিন ছিল শুক্রবার। মওলানা লিয়াকত আলী সাহেবের সঙ্গে শেষ জুমআর নামায আদায় করে স্ত্রী-পুত্রকন্যাসহ রুশদ্বীপে চলে এলাম। আমাকে বিদায় জ্ঞাপন করবার জন্য শেষ পর্যন্ত বহু মেয়ে আমাদের সঙ্গে এসেছিল। বিকেল চারটার সময় রুশদ্বীপ থেকে নৌকাযোগে গান বোটের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় তীরবর্তী অসংখ্য নর-নারী আনন্দে ও দুঃখে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে রোদন করছিল।

এসময় আমি আমার স্ত্রী ও আমাদের ছয়টি সন্তান আমরা মোট আটটি প্রাণী ছিলাম। আমার সঞ্চিত ও স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ সর্বমোট তখন আট হাজার টাকা। আমার অতীত স্মৃতি স্মরণে এলো। মনে পড়ে ১৮৬৬ সালের ১১ই জানুয়ারী তারিখে এই ঘাটেই নেংটি পরা অবস্থায় নিতান্তই একাকী জাহাজ থেকে অবতরণ করেছিলাম। আর আজ? আজ এহেন দুঃখ কষ্টের স্থান থেকেই আট হাজার টাকা ও আটটি প্রাণী সমবেত ফিরে চলেছি। একি আশ্চর্য কুদরত! সেদিন যমুনা জাহাজ আমাকে যে স্থানে নামিয়ে দিয়েছিল আজ যে জাহাজে আরোহণ করতে যাচ্ছি, তাও ঠিক সেই জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন ভোরবেলা জাহাজ থেকে নেমেছিলাম, আর আজ সন্ধ্যাবেলায় জাহাজে উঠছি। আঠারো বৎসর কাল আমার এই দ্বীপে অবস্থানকে একটি দীর্ঘ স্বপ্ন বলে মনে হল। মনে হচ্ছিল, আজই সকাল বেলা যমুনা জাহাজ থেকে নেমেছি এবং এই বিকেল বেলায় ফিরে চলেছি।

www.boighar.com

বিদায়

যাই হোক, বিকেল পাঁচটার সময় মহারাণী নামক জাহাজে উঠে তার এককোণে নিজেদের স্থান করে নিলাম। দেখি আমরা ছাড়া আরো বহু মুক্তিপ্রাপ্ত নর-নারী– ইউরোপীয় ও হিন্দুস্তানী যাত্রী আছে। মৌসুম বেশ মনোরম। এবং সমুদ্র স্বাভাবিক। ঢেউ বা তুফানের নাম গন্ধ নেই। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ ছেড়ে দিল। আমরাও সজল নয়নে আন্দামান দ্বীপগুলিকে একে একে বিদায় জানিয়ে পশ্চাতে ফেলে যেতে থাকি। ক্রমে রাত্রি হল। জ্যোস্নালোকে সমুদ্রের তরঙ্গ বিদ্যুতের মতো চমকে উঠলো।

দ্বিতীয় দিনে আমাদের জাহাজ কোকোদ্বীপে উপনীত হলো। দুইদিন চলবার পর কিছু বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। যাত্রীদের তাতে অসুবিধে কিন্তু আরো কিছুদূর অগ্রসর হতেই বৃষ্টি একদম বন্ধ হয়ে গেল। আর তাতে দুঃখ কষ্টের শেষ। আলী রেজা

নামে একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী যারপর নেই, আমাদের যতন নিচ্ছিলেন। সকাল-সন্ধ্যা তিনি আমাদের জন্য মাছ-মাংস, নানা রকম উৎকৃষ্ট খাবার, চা-কফি বরফ-ফলমূল, মণ্ডা-মিঠাই সর্বদাই তৈরী রাখতেন।

বেশ আরামেই সফর কেটে গেল। যখন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, নূরুদ্দীন নামক একজন মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীর স্ত্রীর প্রসব বেদনা আরম্ভ হলো। পানিতে ভিজে, শীতে তখন যাত্রীদের করুণ অবস্থা। তেমনি প্রসূতিও ঠাণ্ডায় কম্পিত কলেবরে তার প্রথম সন্তানের জন্ম দিল। এখানে আসওয়ানী (এক প্রকার ঔষধ) কোথায় পাওয়া যাবে? কাজেই প্রসূতির কপালেও ডালভাত। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, মা ও শিশু কারুর অসুখ বিসুখ হয়নি। উভয়েই সুস্থ। জাহাজ যখন কলকাতায় পৌঁছলো শিশুর বয়স তখন মাত্র দুই দিন। কিন্তু তাতে কি! মা তর তর করে জাহাজ থেকে নেমে গেল। মুক্তির এমনি মহিমা। স্বাধীনতার এমনি আনন্দ!

ঘরের পানে

চারদিন চার রাত্রি জাহাজে অতিবাহিত করবার পর তেরই নভেম্বর আমরা কলকাতায় পৌঁছলাম। সেখানে চীনা পাড়ায় মওলানা আবদুর রহীম সাহেবের সহোদর মওলানা আবদুর রউফ সাহেবের বাসায় গিয়ে উঠি। এখানে তিন দিন কাটালাম। তৃতীয় দিন রাত ৯টার সময় কলকাতা থেকে রেলযোগে আম্বালা অভিমুখে যাত্রা করি। কলকাতা থেকে এলাহাবাদ, এলাহাবাদ থেকে কানপুর, কানপুর থেকে আলীগড়, আলীগড় থেকে সাহারানপুর। এবং সেখান থেকে আম্বালা পর্যন্ত মঞ্জিলে টিকিট কিনে কিনে চললাম। এরপর উনিশে নভেম্বর রাত নটার সময় ক্যাম্প আম্বালা ষ্টেশনে উপনীত হই। কলকাতা থেকে আম্বালা পর্যন্ত দুইজন সেপাই ও একজন নায়েক আমার ছেলেমেয়ে ও মালপত্র দেখা শোনার জন্য আর্দালী হিসাবে আমার সঙ্গে ছিল।

দ্বিতীয় দিন ভোরবেলা আমি আম্বালা শহর পৌঁছলাম। মনে মনে আমার এই বিশ বৎসরকাল সফরের পথ ভারতের মানচিত্রে পরিমাপ করি। দেখতে পেলাম, আম্বালা থেকে লাহোর ও বোম্বাই হয়ে পোর্ট ব্লেয়ার এবং পোর্ট ব্লেয়ার থেকে কলকাতা হয়ে আম্বালা পর্যন্ত মোট প্রায় সাত হাজার মাইল অতিক্রম করেছি। অন্য কথায়, ভারতের উত্তরাঞ্চলের কিছুটা ছাড়া গোটা ভারতের সমগ্র সীমাপরিমাণ পথ ভ্রমণ করা হয়েছে। ক্যাম্প আম্বালার সদর বাজারে একটি বাড়ি ভাড়া করে পরিবার নিয়ে সেখানে উঠলাম।

এখানে ওদের সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়ে এগারোই ডিসেম্বর তারিখে রেলযোগে দিল্লী রওনা হলাম। সেখানে একরাত্রি কাটলো। তারপর দিন বিকেলে এক্কা

গাড়ি করে পানিপথে পৌঁছি। ঘটনাক্রমে পুরো বিশ বছর পর এও ঠিক সেই তেরই ডিসেম্বর। এই তারিখেই বিশ বৎসর আগে আমি পানিপথ থেকে দিল্লী পলায়ন করেছিলাম। এই দৈব যোগাযোগে অবাক বিস্ময়ে মনে হলো, আজই ভোরবেলা আমি আমার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে পানিপথে রেখে দিল্লী গিয়েছিলাম এবং দিল্লী থেকে আজই পানিপথে ফিরে এলাম।

যাই হোক, মাগরিবের নামাজের পর পানিপথে আমার বাড়িতে পৌঁছলাম। বলা বাহুল্য, আমার স্ত্রী ও আমার কন্যা আমাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। আমার ফেরার হওয়ার দিন যার বয়েস ছিল মাত্র কয়েকমাস সেই মেয়ে এখন বিশ বৎসরের পূর্ণ যুবতী।

পানিপথে পাঁচদিন থেকে কর্ণাল হয়ে থানেশ্বরে গেলাম এবং সেখানে একরাত্রির মাত্র কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আবার আম্বালায় ফিরে এলাম। যেখানেই গিয়েছি, আমাকে দেখার জন্য হাজার হাজার লোক ভিড় করেছে।

দেশে পৌঁছে যখন দেখলাম সরকারী আক্রোশে নিপতিত বলে কোন দেশী লোকও আমাকে চাকরিতে নিয়োগ করেন না, তখন বাধ্য হয়ে পাঞ্জাব সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমি সরকারী চাকরির জন্য দরখাস্ত করলাম। কিন্তু পাঞ্জাব সরকারের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে আম্বালা বিভাগের কমিশনার লিখলেন (পত্র নং ২৪, তাং এপ্রিল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ) যে, মুহম্মদ জাফরকে চাকরি বা ওকালতি করবার অনুমতি কিছুতেই দেওয়া উচিত হবে না। কারণ, সুযোগ পেলেই সে পুনরায় সরকারের সঙ্গে শত্রুতা করবে। চাকরি ও ওকালতি উভয় দিক থেকে বঞ্চিত হয়ে আপীল-নবিশী কাজের অনুমতি চেয়ে আবার দরখাস্ত করি। কিন্তু তাও না-মঞ্জুর হয়ে গেল।

আবেদন

আমার প্রতি লোকাল গভর্ণমেন্টের মনোভাব যখন এই, তখন আমি ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডাফরিন বাহাদুরকে সমস্ত বৃত্তান্ত লিখে জানালাম। অবশ্য আজ পর্যন্ত তাঁরা এর জবাবদানে আমাকে অনুগৃহীত করেননি। এরপর আমার তৃতীয়া স্ত্রী, যাকে কর্তৃপক্ষ পোর্টব্লেয়ার থেকে আমার সঙ্গে চলে আসতে বাধ্য করেছিল, সে পাঞ্জাব গভর্ণমেন্টের নিকট একখানা আবেদন পত্র প্রেরণ করল। তাতে লেখা ছিল– ১. যতদিন সরকার বাহাদুর আমার স্বামীকে নজরবন্দী করে রাখবেন, যে কারণে তিনি জীবিকার্জনের কোন উপায়ই করতে পারছেন না, ততদিন পর্যন্ত যেন সরকার আমাদের খোরাক পোষাক ও থাকবার জন্য একখানা বাড়ির ব্যবস্থা করেন। ২. আর যদি খোরাক পোষাক প্রদান করা

সরকারের পক্ষে কষ্টকর হয়, তাহলে তারা যেন অবশ্য অবশ্য আমাদের আজাদ করে দেন। কারণ, নজরবন্দী রেখে খোরাক পোষাক না দেওয়ার মতো অন্যায় আর কিছু হতে পারে না। ৩. এর কোনটাই যদি সরকারের পক্ষে করা সম্ভব না হয়, তাহলে সরকারী খরচে যেখান থেকে আমাদের আনা হয়েছে, সেখানেই ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

সরকার বিদ্বেষপরায়ণ না হলে উল্লিখিত তিনটি প্রার্থনার একটি নিশ্চয় মনজুর করতেন। দিল্লীর কমিশনার সাহেবের নিকট অভিমত চাইলে, তিনি লিখেছিলেন, মুহম্মদ জাফরকে আজাদ দেওয়াই উচিত। যাতে সে নিজের রুজির ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে পারে। কিন্তু পাঞ্জাবের একজন নামকরা খয়ের খাঁ স্যার বাচ্চন সাহেরেব 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ' জবাব (পত্র নং ১৪১৭, তাং ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ পাঞ্জাব গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারীর তরফ থেকে দিল্লী বিভাগের কমিশনারের নিকটে)-এর ফলে এই মতেরও কোন দাম রইল না। সাহেব প্রবরের জবাব কাজী রতল বুক সাহেবের বিখ্যাত ফয়সালা অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়। তিনি লিখলেন, 'মুগল সাম্রাজ্যের রাজধানী ও বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল দিল্লী জেলা ব্যতীত পাঞ্জাবের যে কোন শহরে মহম্মদ জাফর বাস করতে পারে। কিন্তু যেখানেই যাক না কেন, সর্বত্র তার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য তার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ থাকবে, যেন কোন মহাজন বা সওদাগর অজ্ঞতাবশত তাকে চাকরিতে নিয়োগ না করে। পাঞ্জাবেও কোন রাজা বা নওয়াবের রাজ্যে যেতে তাকে ইজাজত দেওয়া যাবে না।'

এই সমস্ত বিদ্বেষমূলক নির্দেশাবলীর পরিষ্কার অর্থ এই দাঁড়ায়, আমি যেন আমার সন্তান-সন্ততিসহ অনাহারে মৃত্যুবরণ করি। আমার আশ্চর্য লাগে এই যে, সরকার বাহাদুরের নিয়াত যদি এই ছিল, তাহলে আমার মতো মুসলমানকে যার আচরণ সম্পর্কে সমগ্র হিন্দুস্তানের মুসলমান কান পেতে আছে, মুক্তি দিয়ে ফিরিয়ে আনবার কি প্রয়োজন ছিল।

যাই হোক, আমার এই বেকার থাকাকেও আমি আল্লাহ পাকের একটি নিয়ামত মনে করি। সত্যিকার কথা এই যে, ক্ষুন্নিবৃত্তির কোন ব্যবস্থা, চাকরি বা কোন কাজ, কিছুই না থাকার ফলে আমি যে অবসর ও নির্জনতা পেলাম এবং আমার যে ঈমানের উন্নতি হলো, তা ওকালতি ও চাকরি অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেয়। আমার প্রতি তাঁর নেক নজর ও নেয়ামতের বর্ণনা কতই আর করবো? আমার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অন্য কারুর উপর ন্যস্ত না হয় তাঁর এই অভিপ্রায়ের একটি উৎকৃষ্ট নজীর এই যে, ক্যাপ্টেন টেম্পল সাহেব যখন বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে আমার দেখাশোনা করছিলেন তখন আমার মনোযোগ মুসাব্বেবুল

আসবাবের প্রতি না হয়ে এই সাহেবের অনুকম্পার প্রতিই নিয়োজিত ছিল। কিন্তু এই শেরেকী মনোভাবে আমার লিপ্ত হওয়া সেই 'আহদাহু লা-শরীক'-এর আদৌ মনঃপূত ছিল না। তাই তিনি টেম্পল সাহেবকে অবিলম্বে স্থানান্তরিত করে বাহ্যিক কোন উপায় ছাড়াই আমার প্রতি তাঁর রাজ্জাকী গুণের পরিচয় দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে যাত্রাকালে আমার মনে স্বাভাবিকভাবেই এই চিন্তার উদয় হয়েছিল যে, আমি যেহেতু আরবি, ফারসী, উর্দু, ইংরেজি, নাগরী প্রভৃতি ভাষায় শিক্ষিত এই ইংরেজি আদালতের আইন-কানুনসমূহ ও সরকারী চাকরির নিয়মাবলী সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান অর্জন করেছি সুতরাং বিরাট ভারত রাষ্ট্রে কখনই আমার রুজী রোজগারের অভাব হবে না। কিন্তু এই কারূনী চিন্তাধারাও সেই কাদেরে-মোতলেবের অভিপ্রেত ছিল না। তাই দেখতে পাই, আমার এত জ্ঞান-গরিমা থাকা সত্ত্বেও মাসিক পাঁচ টাকা বেতনের একটি চাকরি যোগাড় করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

○ ○ ○